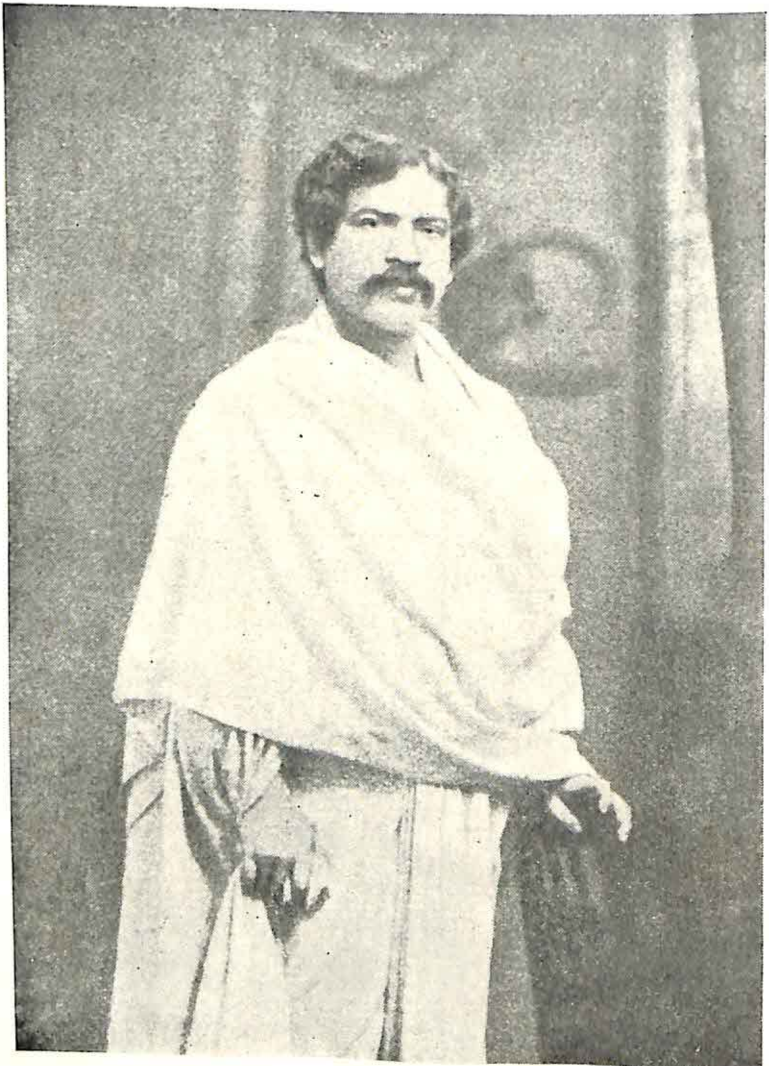
অব্যক্ত

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু



বিলাতে জগদীশচন্দ্র। ১৯০১

অব্যক্ত

শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু

বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩২৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ১৯৩৮
তৃতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৫৮
চতুর্থ মুদ্রণ পৌষ ১৩৬৪
শতবার্ষিক সংস্করণ ৩০ নভেম্বর ১৯৫৮
পঞ্চম মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৯৬ (জুন ১৯৮৯)

প্রকাশক :
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির (প্রকাশন বিভাগ)
৯৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
দাস প্রিণ্টার্স
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

কথারম্ভ

ভিতর ও বাহিরের উত্তেজনায় জীব কখনও কলরব কখনও আর্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে বিবিধ মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে, সেখানে বাদ-প্রতিবাদ কেবল ইয়োরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। এ দেশেও প্রিভিকাউন্সিলের রায় না পাওয়া পর্যন্ত কোনো মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না।

জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে? ইহার প্রতিকারের জন্য এ দেশে বৈজ্ঞানিক-আদালত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। ফল হয়তো এ জীবনে দেখিব না; প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরের ভবিষ্যৎ বিধাতার হস্তে।

বন্ধুবর্গের অনুরোধে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। চতুর্দিক ব্যাপিয়া যে অব্যক্ত জীবন প্রসারিত, তাহার দু-একটি কাহিনী বর্ণিত হইল। ইহার মধ্যে কয়েকটি লেখা মুকুল, দাসী, প্রবাসী, সাহিত্য এবং ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির
১লা বৈশাখ, ১৩২৮

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

সূচী

পরিশিষ্ট

চিত্রসূচী

অব্যক্ত

পুরাতন লইয়াই বর্তমান গঠিত, অতীতের ইতিহাস না জানিলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়ই রহিবে। পুরাতন ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে সেকালে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইত, তাহা জানা আবশ্যক। লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলাম, দেড় হাজার বৎসর পূর্বের জীবন্ত চিত্র এখনও অজন্তার গুহামন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল পথ অনেক সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু বহুবৎসর পূর্বে যখন অজন্তা দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন রাস্তাঘাট বিশেষ কিছুই ছিল না। রেল-স্টেশন হইতে প্রায় এক দিনের পথ। বাহন গোরুর গাড়ি। অনেক কষ্টের পর অজন্তা পৌঁছিলাম। মাঝখানের পার্বত্য নদী পার হইয়া দেখিলাম, পর্বত খুদিয়া গুহাশ্রেণী নির্মিত হইয়াছে; ভিতরে কারুকার্যের পরাকাষ্ঠা। গুহার প্রাচীর ও ছাদে চিত্রাবলী অঙ্কিত; তাহা সহস্রাধিক বৎসরেও ম্লান হয় নাই। দরবার চিত্রে দেখিলাম, পারস্য দেশ হইতে দূত রাজদর্শনে আসিয়াছে। অন্য স্থানে ভীষণ সমর চিত্র। তাহাতে এক দিকে অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিতা নারীসৈন্য যুদ্ধ করিতেছে। আর এক কোণে দেখিলাম, দুইখানা মেঘ দুই দিক হইতে আসিয়া প্রহত হইয়াছে। ঘূর্ণায়মান বাষ্পরাশিতে মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারা পরস্পরের সহিত ভীষণ রণে যুঝিতেছে। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে আরব্ধ হইয়াছে; এখনও চলিতেছে,

ভবিষ্যতেও চলিবে। প্রতিদ্বন্দ্বী আলো ও আঁধার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, ধর্ম ও অধর্ম। যখন সবিতা সপ্তঅশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে পূর্বদিকে উত্থিত হইবেন, তখনই আঁধার পরাহত হইয়া পশ্চিম গগনে মিলাইয়া যাইবে।

আর-একখানি চিত্রে রাজকুমার প্রাসাদ হইতে জনপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্যাধি-জর্জরিত, শোকার্ত মানবের দুঃখ তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে। কি করিয়া এই দুঃখপাশ ছিন্ন হইবে, তিনি আজ রাজ্য ও ধনসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইবেন। আজ মহাসংক্রমণের দিন।

অর্ধ-অন্ধকার-আচ্ছন্ন গুহামন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পর্বতগাত্রে প্রশান্ত বুদ্ধমূর্তি খোদিত রহিয়াছে। সুখ-দুঃখের অতীত শান্তির পথ তাঁহারই সাধনার ফলে উন্মুক্ত হইয়াছে।

সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, ততদূর জনমানবের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। প্রান্তর ধূধূ করিতেছে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে অকাট্য ব্যবধান, পারাপারের কোনো সেতু নাই। গুহার অন্ধকারে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা যেন কোনো স্বপ্নরাজ্যের পুরী। অশান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম।

ইহার কয় বৎসর পর কোনো সম্ভ্রান্ত জনভবনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেখানে অনেকগুলি চিত্র ছিল; অন্যমনস্কভাবে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একখানা ছবি দেখিয়া চমকিত হইলাম।

এই ছবি তো পূর্বে দেখিয়াছি— সেই গুহামন্দিরের প্রশান্ত বুদ্ধমূর্তি। চিত্রে আরও কিছু ছিল যাহা পূর্বে দেখি নাই। মূর্তির নীচেই একখানা পাথরের উপরে নিদ্রিত শিশু, নিকটেই জননী ঊর্ধ্বোত্থিত যুক্তকরে পুত্রের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধদেবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছে। যিনি সমস্ত জীবের দুঃখভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই মায়ের দুঃখ দূর করিবেন। অমনি মানস-চক্ষে আর একটি দৃশ্য দেখিলাম। বোধিবৃক্ষতলে উপবাসক্লিষ্ট মুমূর্ষু গৌতম। দুস্থজন দেখিয়া সুজাতার মাতৃহৃদয় উথলিত। দেখিতে দেখিতে অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে মমতা ও স্নেহরচিত একটি সেতু গঠিত হইল এবং সেকাল ও একালের ব্যবধান ঘুচিয়া গেল।

আমার পার্শ্বে একজন বিদেশী বলিলেন— দেখো, দেবতার মুখ কিরূপ নির্মম— এক দিকে মাতার এত আগ্রহ, এত স্তুতি, কিন্তু দেবতার কেবল নিশ্চল দৃষ্টি! এই অবোধ নারী প্রস্তর-মূর্তির মুখে কিরূপে করুণা দেখিতে পাইতেছেন?

তখন প্রকৃতির উপাসক জ্ঞানীদের কথা মনে হইল। এই অবোধ মাতা ও অজ্ঞাতবাদী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কি এতই প্রভেদ?

প্রকৃতিও কি ক্রূর নয়? তাহার অকাট্য অপরিবর্তনীয় লৌহের ন্যায় কঠিন নিয়মশৃঙ্খলে কয়জনে মমতা দেখিতে পায়? অনন্তশক্তি চক্র যখন উদ্ধতবেগে ধাবিত হয় তখন তাহা দ্বারা পেষিত জীবগণকে কে তুলিয়া লয়?

সকলে প্রকৃতির হৃদয়ে মাতৃস্নেহ দেখিতে পান না। আমরা যাহা দেখি তাহা তো আমাদের মনের প্রতিকৃতি মাত্র। যাহার উপর চক্ষু পড়ে তাহা কেবল উপলক্ষ। কেবল প্রশান্ত গভীর জলরাশিতেই প্রকৃত প্রতিবিম্ব দেখিলে দেখা যায়। এই বিত্রস্ত জলরাশির ন্যায় সদা-সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে কিরূপে নিশ্চল প্রতিমূর্তি বিম্বিত হইবে?

যাঁহার ইচ্ছায় অনন্ত বারিধি বাত্যাতাড়নে ক্ষুব্ধ হয়, কেবল তাঁহার আজ্ঞাতেই জলধি শান্তিময়ী মূর্তি ধারণ করে। কে বলিবে ঐ অবোধ মাতার হৃদয় এক শান্তিময় করস্পর্শে কমনীয় হয় নাই?

আমরা যাহা দেখিতে পাই না, পুত্রবাৎসল্যে অভিভূত ধ্যানশীলা জননী তাহা দেখিতে পান। তাঁহার নিকট ঐ প্রস্তর-মূর্তির পশ্চাতে স্নেহময়ী জগজ্জননীর মূর্তি প্রতিভাসিত! দেখিতে দেখিতে আমার মনে হইল যেন ঊর্ধ্ব হইতে অমৃত ক্ষীরধারা পতিত হইয়া মাতা ও সন্তানকে শুভ্র ও পবিত্র করিয়াছে।

অনেক সময়ে এক অপূর্ণতা আসিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য ও সজীবতা অপহরণ করে। আলো ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ-মিশ্রিত দৃশ্য অসামঞ্জস্যহেতু অশান্তিপূর্ণ হয়; অথচ আলো ও অন্ধকারের সমাবেশ ভিন্ন সুচিত্র হয় না। কেবল আলো কিংবা কেবল অন্ধকারে চিত্র অপরিস্ফুট থাকে। যে দৃশ্যের কথা উল্লেখ করিলাম, উহার ন্যায় জীবনচিত্র অনেক সময়

সৌন্দর্যহীন হয়। ঐ চিত্রের ন্যায় একটি শিশু কিংবা নারীর ঊর্ধ্বোত্থিত বাহুতে সমস্ত দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া যায়। আলো ও ছায়া, সুখ ও অপরিহার্য দুঃখ তখন স্ব-স্ব নির্দিষ্ট স্থানে সমাবিষ্ট হয়। তখন সেই দুইখানি উত্তোলিত যুক্তহস্ত হইতে কিরণরেখা অন্ধকার ভেদ করিয়া সমস্ত দৃশ্য জ্যোতির্ময় করে।

আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ

দৃশ্য জগৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম লইয়া গঠিত। রূপক অর্থে এ কথা লইতে পারা যায়। এ জগতে অসংখ্য ঘটনাবলীর মূলে তিনটি কারণ বিদ্যমান। প্রথম পদার্থ, দ্বিতীয় শক্তি, তৃতীয় ব্যোম, অথবা আকাশ।

পদার্থ ত্রিবিধ আকারে দেখা যায়। ক্ষিত্যাকারে— অর্থাৎ কঠিনরূপে ; দ্রবাকারে— অর্থাৎ অপ্‌রূপে ; বায়বাকারে— অর্থাৎ মরুৎরূপে। জড় পদার্থ সর্বসময়ে শক্তি অথবা তেজ দ্বারা স্পন্দিত হইতেছে। এই মহাজগৎ ব্যোমে দোলায়মান রহিয়াছে। মহাশক্তি অনন্ত চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। তাহারই বলে অসীম আকাশে বিশ্বজগৎ ভ্রমণ করিতেছে, উদ্ভূত হইতেছে এবং পুনরায় মিলাইয়া যাইতেছে।

সর্বাগ্রে দেখা যাউক, শক্তি কি প্রকারে স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয়।

রেলের স্টেশনে সংকেত প্রেরণের দণ্ড সকলেই দেখিয়াছেন। একদিকে রজ্জু আকর্ষণ করিলে দূরস্থ কাষ্ঠখণ্ড সঞ্চালিত হয়।

এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকারেও শক্তি সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। নদীর উপর দিয়া জাহাজ চলিয়া যায় ; কলের আঘাতে জল তরঙ্গাকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীতটে বারংবার আঘাত করে। এ স্থলে কলের আঘাত তরঙ্গবলে দূরে নীত হয়।

বাদ্যকরের অঙ্গুলিতাড়িত তন্ত্রীও এইরূপে স্পন্দিত হয়। এই

স্পন্দনে বায়ুরাশিতে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। শব্দজ্ঞান বায়ুতরঙ্গের আঘাতজনিত।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীতও সচরাচর অনেক সুর শুনিতে পাওয়া যায়। বায়ুকম্পিত বৃক্ষপত্রে, জলবিন্দুপতনে, তরঙ্গাহত সমুদ্র-তীরে বহুবিধ সুর শ্রুতিগোচর হয়।

সেতারের তার যতই ছোটো করা যায়, সুর ততই চড়া হয়। যখন প্রতি সেকেণ্ডে বায়ু ৩০,০০০ বার কাঁপিতে থাকে তখন কর্ণে অসহ্য অতি উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও ক্ষুদ্র করিলে হঠাৎ শব্দ থামিয়া যাইবে। তখনও তার কাঁপিতে থাকিবে, তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে; কিন্তু এই উচ্চ সুর আর কর্ণে ধ্বনি উৎপাদন করিবে না।

কে মনে করিতে পারে যে, শত শত ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আমরা তাহা শুনিয়াও শুনিতে পাই না? গৃহে বাহিরে নিরন্তর অগণিত সংগীত গীত হইতেছে; কিন্তু তাহা আমাদের শ্রবণের অতীত।

জড়পদার্থের কম্পন ও তজ্জনিত সুরের কথা বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আকাশেও সর্বদা অসংখ্য তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। অঙ্গুলিতাড়নে প্রথমে বাদ্যযন্ত্রে ও তৎপরে বায়ুতে যেরূপ তরঙ্গ হয়, বিদ্যুত্তাড়নেও সেইরূপে আকাশে তরঙ্গ উদ্ভূত হয়। বায়ুর তরঙ্গ আমরা কর্ণ দিয়া শ্রবণ করি, আকাশের তরঙ্গ সচরাচর আমরা চক্ষু দিয়া দেখি।

বায়ুর তরঙ্গ আমরা অনেক সময়ে শুনিতে পাই না। আকাশের তরঙ্গও সর্বসময়ে দেখিতে পাই না।

দুইটি ধাতুগোলক বিদ্যুদ্‌যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া দিলে, গোলক দুইটি বারংবার বিদ্যুত্তাড়িত হইবে, এবং তড়িদ্বলে চতুর্দিকের আকাশে তরঙ্গ ধাবিত হইবে। তার ছোটো করিলে, অর্থাৎ গোলক দুইটিকে ক্ষুদ্র করিলে, সুর উচ্চে উঠিবে। এইরূপ প্রতিমুহূর্তে সহস্র কম্পন হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে কোটি, এবং তাহা হইতে কোটি কোটি কম্পন উৎপন্ন হইবে।

মনে করো, অন্ধকার গৃহে অদৃশ্য শক্তিবলে বায়ু বারংবার আহত হইতেছে। কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গভীর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কম্পনসংখ্যা যতই বর্ধিত করা যাইবে, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তমে উঠিবে। অবশেষে সহসা কর্ণবিদারী সুর থামিয়া নিস্তব্ধতায় পরিণত হইবে। ইহার পর লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ কর্ণে আঘাত করিলেও আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারিব না।

এক্ষণে বিদ্যুদ্বলে আকাশে তরঙ্গ উৎপন্ন করা যাউক; লক্ষাধিক তরঙ্গ প্রতি মুহূর্তে চতুর্দিকে ধাবিত হইবে। আমরা এই তরঙ্গান্দোলিত সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও অক্ষুণ্ণ থাকিব। সুর ক্রমে উচ্চে উত্থিত হইতে থাকুক। প্রতি সেকেণ্ডে যখন কোটি কোটি তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, তখন অকস্মাৎ নিদ্রিত ইন্দ্রিয় জাগরিত হইয়া উঠিবে, শরীর উত্তাপ অনুভব করিবে। সুর

আরও উচ্চে উত্থিত হইলে যখন অধিকতর সংখ্যক তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া রক্তিম আলোক-রেখা দেখা যাইবে। কম্পনসংখ্যার আরও বৃদ্ধি হউক— ক্রমে ক্রমে পীত, হরিৎ, নীল আলোকে গৃহ পূর্ণ হইবে। ইহার পর সুর আরও উচ্চে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হইবে, আলোকরাশি পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ইহার পর অগণিত স্পন্দনে আকাশ স্পন্দিত হইলেও আমরা কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা অনুভব করিতে পারিব না।

তবে তো আমরা এই সমুদ্রে একেবারে দিশাহারা! আমরা বধির ও অন্ধ! কি দেখিতে পাই, কি শুনিতে পাই? কিছুই নয়! দুই-একখানা ভগ্ন দিক্‌দর্শনশলাকা লইয়া আমরা মহাসমুদ্রে যাত্রা করিয়াছি।

পূর্বে বলিয়াছি, উত্তাপ ও আলোক আকাশের বৈদ্যুতিক স্পন্দন মাত্র। যে স্পন্দন ত্বক্ দ্বারা অনুভব করি তাহার নাম উত্তাপ; আর যে কম্পনে দর্শনেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় তাহাকে আলোক বলিয়া থাকি। ইহা ব্যতীত আকাশে বহুবিধ স্পন্দন আছে, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

হস্তী-দেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া অন্ধেরা একই জন্তুর বিভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়াছিল; শক্তি সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ কল্পনা করি।

কিয়ৎকাল পূর্বে আমরা চুম্বকশক্তি, বিদ্যুৎ, তাপ ও

আলোককে বিভিন্ন শক্তি বলিয়া মনে করিতাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, এ সকল একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। চুম্বকশক্তি ও বিদ্যুতের সম্বন্ধ সকলেই জানেন। তাপরশ্মি ও আলোক যে আকাশের বৈদ্যুতিককম্পনজনিত, ইহা অল্পদিন হইল প্রমাণিত হইয়াছে।

আকাশ দিয়া ইহাদের তরঙ্গ একই গতিতে ধাবিত হয়, ধাতুপাত্রে প্রতিহত হইয়া একই রূপে প্রত্যাবর্তন করে, বায়ু হইতে অন্য স্বচ্ছ দ্রব্যে পতিত হইয়া একই রূপে বক্রীভূত হয়। কম্পনসংখ্যাই বৈষম্যের একমাত্র কারণ।

সূর্য এই পৃথিবী হইতে নয় কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের উপরে বায়ুমণ্ডল ৪৫ মাইল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তার পর শূন্য। দূরস্থ সূর্যের সহিত এই পৃথিবীর আপাততঃ কোনো যোগ দেখা যায় না।

অথচ সূর্যের বহ্নিময় সাগরে আবর্ত উত্থিত হইলে, এই পৃথিবী সেই সৌরোৎপাতে ক্ষুব্ধ হয়— অমনি পৃথিবী জুড়িয়া বিদ্যুৎস্রোত বহিতে থাকে।

সুতরাং যাহা বিচ্ছিন্ন মনে করিতাম, প্রকৃতপক্ষে তাহা বিচ্ছিন্ন নহে। শূন্যে বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি জগৎ আকাশসূত্রে গ্রথিত। এক জগতের স্পন্দন আকাশ বাহিয়া অন্য জগতে সঞ্চালিত হইতেছে।

সূর্যকিরণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া নানা রূপ ধরিতেছে।

সূর্যকিরণেই বৃক্ষ বর্ধিত হয়, পুষ্প রঞ্জিত হয়। কিরণরূপ আকাশ-কম্পন আসিয়া বায়ুস্থিত অঙ্গারক অণুগুলি বিচলিত করিয়া বৃক্ষদেহ গঠিত করে। অসংখ্য বৎসর পূর্বের সূর্যকিরণ বৃক্ষদেহে আবদ্ধ হইয়া পৃথ্বীগর্ভে নিহিত আছে। আজ কয়লা হইতে সেই কিরণ নির্মুক্ত হইয়া গ্যাস ও বিদ্যুদালোকে রাজবর্ত্ম আলোকিত করিতেছে। বাষ্পযান, অর্ণবপোত এই শক্তিতেই ধাবিত হয়। মেঘ ও বাত্যা একই শক্তিবলে সঞ্চালিত হইতেছে।

সূর্যকিরণে লালিত উদ্ভিদ্ ভোজন করিয়াই প্রাণিগণ জীবনধারণ করিতেছে ও বর্ধিত হইতেছে। তবে দেখা যায় যে, এই ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্ব গতির মূলে সূর্যকিরণ। আকাশের স্পন্দন দ্বারাই পৃথিবী স্পন্দিত হইতেছে; জীবনের স্রোত বহিতেছে।

আমাদের চক্ষুর আবরণ ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইল। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই বহুরূপী বিবিধ শক্তিশালী জগতের মূলে দুইটি কারণ বিদ্যমান। এক, আকাশ ও তাহার স্পন্দন; অপর, জড় বস্তু।

জড় পদার্থ বিবিধ আকারে দেখা যায়। এক সময়ে লৌহবৎ কঠিন, কখনও দ্রব, কখনও বায়বাকার, আবার কখনও বা তদপেক্ষা সূক্ষ্মতররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শূন্যে উড্ডীন অদৃশ্য বাষ্প আর প্রস্তরবৎ কঠিন তুষার একই পদার্থ; কিন্তু আকারে কত প্রভেদ!

গৃহমধ্যে নিশ্চল বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার অস্তিত্ব সহসা আমরা কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু এই অদৃশ্য সূক্ষ্ম বায়ুরাশিতে আবর্ত্ত উত্থিত হইলে উহা বিভিন্ন গুণ ধারণ করে। আবর্তময় অদৃশ্য বায়ুর কঠিন আঘাতে মুহূর্তমধ্যে গ্রাম জনপদ বিনষ্ট হইবার কথা সকলেই জানেন।

জড় পদার্থ আকাশের আবর্ত মাত্র। কোনো কালে আকাশ-সাগরে অজ্ঞাত মহাশক্তিবলে অগণ্য আবর্ত উদ্ভূত হইয়া পরমাণুর সৃষ্টি হইল। উহাদের মিলনে বিন্দু, অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টিতে জগৎ, মহাজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

আকাশেরই আবর্ত জগৎরূপে আকাশ-সাগরে ভাসিয়া রহিয়াছে।

জার্মান কবি রিক্‌টার স্বপ্নরাজ্যে দেবদূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। দেবদূত কহিলেন, 'মানব, তুমি বিশ্ব-রচয়িতার অনন্ত রচনা দেখিতে চাহিয়াছ— আইস, মহাবিশ্ব দেখিবে।' মানব দেবস্পর্শে পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবদূতসহ অনন্ত আকাশপথে যাত্রা করিল। আকাশের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর ভেদ করিয়া তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তগ্রহ পশ্চাতে ফেলিয়া মুহূর্তের মধ্যে সৌরদেশে উপনীত হইল। সূর্যের ভীষণ অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত মহাপাবকশিখা তাহাদিগকে দগ্ধ করিল না। পরে

সৌররাজ্য ত্যাগ করিয়া সুদূরস্থিত তারকার রাজ্যে উপস্থিত হইল। সমুদ্রতীরস্থ বালুকাকণার গণনা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এই অসীমে বিক্ষিপ্ত অগণ্য জগতের গণনা কল্পনারও অতীত। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়া অগণ্য জগতের অনন্ত শ্রেণী! কোটি কোটি মহাসূর্য প্রদক্ষিণ করিয়া কোটি কোটি গ্রহ, ও তাহাদের চতুর্দিকে কোটি কোটি চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে। উর্ধ্বহীন, অধোহীন, দিক্‌হীন অনন্ত! পরে এই মহাজগৎ অতিক্রম করিয়া আরও দূরস্থিত অচিন্ত্য জগৎ উদ্দেশে তাহারা চলিল। সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিয়া কল্পনাতীত নূতন মহাবিশ্ব মুহূর্তে তাহাদের দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল। ধারণাতীত মহাব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সমাবেশ দেখিয়া মানুষ একেবারে অবসন্ন হইয়া কহিল, 'দেবদূত! আমার প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দাও! এই দেহ অচেতন ধূলিকণায় মিশিয়া যাউক। অসহ্য এ অনন্তের ভার! এ জগতের শেষ কোথায়?'

তখন দেবদূত কহিলেন, 'তোমার সম্মুখে অন্ত নাই; ইহাতেই কি তুমি অবসন্ন হইয়াছ? পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখো, এ জগতের আরম্ভও নাই।'

শেষও নাই, আরম্ভও নাই।

মানুষের মন অসীমের ভার বহিতে পারে না। ধূলিকণা হইয়া কিরূপে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা মনে ধারণা করিব?

অণুবীক্ষণে ক্ষুদ্র বিন্দুতে বৃহৎ জগৎ দেখা যায়। বিপর্যয় করিয়া দেখিলে জগৎ ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়; অণুবীক্ষণ বিপর্যয় করিয়া দেখো। ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া ক্ষুদ্র কণিকায় দৃষ্টি আবদ্ধ করো।

আমাদের চক্ষুর সমক্ষে জড়বস্তু মুহূর্তে মুহূর্তে কত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। অগ্নিদাহে মহানগর শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। তাহা বলিয়া একবিন্দুও বিনষ্ট হয় না। একই অণু কখনও মৃত্তিকাকারে, কখনও উদ্ভিদাকারে, কখনও মনুষ্যদেহে, পুনরায় কখনও অদৃশ্য বায়ুরূপে বর্তমান। কোনো বস্তুরই বিনাশ নাই।

শক্তিও অবিনশ্বর। এক মহাশক্তি জগৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; প্রতি কণা ইহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট। এ মুহূর্তে যাহা দেখিতেছি, পরমুহূর্তে ঠিক তাহা আর দেখিব না। বেগবান নদীস্রোত যেরূপ উপলখণ্ডকে বার বার ভাঙিয়া অনবরত তাহাকে নূতন আকার প্রদান করে, এই মহাশক্তিস্রোতও সেইরূপ দৃশ্য জগৎকে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙিতেছে ও গড়িতেছে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই স্রোত অপ্রতিহতগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বিরাম নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। সমুদ্রের এক স্থানে ভাঁটা হইলে অন্য স্থানে জোয়ার হয়। জোয়ার ভাঁটা উভয়ই এককারণজাত; সমুদ্রের জলপরিমাণ সমানই রহিয়াছে। এক স্থানে যত হ্রাস হয়, অপর স্থানে সেই পরিমাণে

বৃদ্ধি পায়। এইরূপ জোয়ার ভাঁটা— ক্ষয় বৃদ্ধি— তরঙ্গের ন্যায় চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

শক্তির তরঙ্গেও এইরূপ— ক্ষয় বৃদ্ধি, প্রত্যেক বস্তু এই তরঙ্গ দ্বারা সর্বদা আহত হইতেছে— উপলখণ্ড ভাঙিতেছে ও গড়িতেছে। শক্তিপ্রক্ষিপ্ত ঊর্মিমালার দ্বারাই জগৎ জীবন্ত রহিয়াছে।

এখন জড়-জগৎ ছাড়িয়া জীব-জগতে দৃষ্টিপাত করি। বসন্তের স্পর্শে নিদ্রিত পৃথিবী জাগরিত করিয়া, প্রান্তর বন আচ্ছন্ন করিয়া, উদ্ভিদ্‌-শিশু অন্ধকার হইতে মস্তক তুলিল। দেখিতে দেখিতে হরিৎ প্রান্তর প্রস্ফুনিত। শরৎকাল আসিল, কোথায় সেই বসন্তের জীবনোচ্ছ্বাস? পুষ্প বৃন্তচ্যুত, জীর্ণ পল্লব ভূপতিত, তরুদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত। জাগরণের পরেই নিদ্রা!

আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিল; শুষ্ক পুষ্পদলে আচ্ছাদিত, বীজে নিহিত, নিদ্রিত বৃক্ষ-শিশু পুনরায় জাগিয়া উঠিল। বৃক্ষ, মৃত্যুর আগমনে জীবনবিন্দু বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সেই বিন্দু হইতে বৃক্ষ পুনর্জীবন লাভ করিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের

অংশ, বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্প-কলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে।

কেবল তাহাই নহে। প্রতি জীবের সম্মুখেও বংশপরম্পরাগত অনন্ত জীবন প্রসারিত।

সুতরাং বর্তমান কালের জীব অনন্তের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ।

আর মনুষ্য ? প্রথম জীবকণিকা মনুষ্যরূপে পরিণত হইবার পূর্বে কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে! অসংখ্য বৎসর-ব্যাপী, বিভিন্ন শক্তিগঠিত, অনন্ত সংগ্রামে জয়ী, জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব!

আজ সেই কীটাণুর বংশধর, দুর্বল জীব স্বীয় অপূর্ণতা ভুলিয়া অসীম বল ধারণ করিতে চাহে। আকাশ হইতে বিদ্যুৎ আহরণ করিয়া স্বীয় রথে যোজনা করে। অজ্ঞান ও অন্ধ হইয়াও পৃথিবীর আদিম ইতিহাস উদ্ধার করিতে উৎসুক হয়। ঘনতিমিরাবৃত যবনিকা উত্তোলন করিয়া ভবিষ্যৎ দেখিবার প্রয়াসী হয়।

যদি কখনও সৃষ্ট জীবে দৈবশক্তির আবির্ভাব সম্ভব হয়, তবে ইহাই সেই দৈবশক্তি।

অধিক বিস্ময়কর কাহাকে বলিব ? বিশ্বের অসীমতা, কিংবা এই সসীম ক্ষুদ্র বিন্দুতে অসীম ধারণা করিবার প্রয়াস— কোন্‌টা অধিক বিস্ময়কর ?

পূর্বে বলিয়াছি, এ জগতের আরম্ভও নাই, শেষও নাই। এখন দেখিতেছি, এ জগতে ক্ষুদ্রও নাই, বৃহৎও নাই।

জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব ! এ কথা সর্ব সময়ের জন্য ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নীত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য হইতে এই বহুরূপী জগৎ ও তদ্‌বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ঊর্ধ্বাভিমুখেই সৃষ্টির গতি। আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত।

গাছের কথা

গাছেরা কি কিছু বলে? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? গাছ কি কোনো দিন কথা কহিয়া থাকে? মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে? আর যাহা ফুটিয়া বলে না, তাহা কি কথা নয়? আমাদের একটি খোকা আছে, সে সব কথা ফুটিয়া বলিতে পারে না; আবার ফুটিয়া যে দুই চারিটি কথা বলে, তাহাও এমন আধো আধো ও ভাঙা ভাঙা যে, অপরের সাধ্য নাই তাহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের খোকার সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারি। কেবল তাহা নয়। আমাদের খোকা অনেক কথা ফুটিয়া বলে না; চক্ষু, মুখ ও হাত নাড়া, মাথা নাড়া প্রভৃতির দ্বারা আকার ইঙ্গিতে অনেক কথা বলে, আমরা তাহাও বুঝিতে পারি, অন্যে বুঝিতে পারে না। একদিন পার্শ্বের বাড়ি হইতে একটি পায়রা উড়িয়া আসিয়া আমাদের বাড়িতে বসিল; বসিয়া গলা ফুলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। পায়রার সঙ্গে খোকার নূতন পরিচয়; খোকা তাহার অনুকরণে ডাকিতে আরম্ভ করিল। 'পায়রা কি-রকম ভাবে ডাকে?' বলিলেই ডাকিয়া দেখায়; তদ্ভিন্ন সুখে দুঃখে, চলিতে বসিতে, আপনার মনেও ডাকে। নূতন বিদ্যাটা শিখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই।

একদিন বাড়ি আসিয়া দেখি, খোকার বড়ো জ্বর হইয়াছে; মাথার বেদনায় চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। যে দুরন্ত

শিশু সমস্ত দিন বাড়ি অস্থির করিয়া তুলিত, সে আজ একবার চক্ষু খুলিয়াও চাহিতেছে না। আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। আমার হাতের স্পর্শে খোকা আমাকে চিনিল, এবং অতি কষ্টে চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে খানিক ক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর পায়রার ডাক ডাকিল। ঐ ডাকের ভিতর আমি অনেক কথা শুনিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, খোকা বলিতেছে, 'খোকাকে দেখিতে আসিয়াছ? খোকা তোমাকে বড়ো ভালোবাসে।' আরও অনেক কথা বুঝিলাম, যাহা আমিও কোনো কথার দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

যদি বল, পায়রার ডাকের ভিতর এত কথা কি করিয়া শুনিলে? তাহার উত্তর এই, খোকাকে ভালোবাসি বলিয়া। তোমরা দেখিয়াছ, ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন ছেলে কি চায়। অনেক সময় কথারও আবশ্যক হয় না। ভালোবাসিয়া দেখিলেই অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত। তার পর গাছ, পাখি, কীট পতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি, সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোনো কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা

জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এ সব কিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবনধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদ্‌গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুতা হয়। তার পর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবন-দান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র। ক্রমে এ সব কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর, কোনো গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে এক-খানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। এক সময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বলো তো এই গাছ আর এই মরা ডালে কি প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে, আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে;

একে জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত তাহা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়ে চড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায় ; জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখির ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম ; বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটি, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম হয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাক্‌না ; তাহার মধ্যে বৃক্ষ-শিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানাপ্রকার, কোনোটি অতি ছোটো, কোনোটি বড়ো। বীজ দেখিয়া গাছ কত বড়ো হইবে বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বটগাছ, সরিষা অপেক্ষা ছোটো বীজ হইতে জন্মে। কে মনে করিতে পারে, এত বড়ো গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে ? তোমরা হয়তো কৃষকদিগকে ধানের বীজ ক্ষেতে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছপালা, বন-জঙ্গল দেখ, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখিরা ফল খাইয়া দূর দেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে

জনমানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমুল-ফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায় তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তুলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম; হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তুলার সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দিন-রাত্রি দেশ-দেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কি না, কেহ বলিতে পারে না। হয়তো কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে তার অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।

যেখানেই বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষ-শিশু অনেক দিন পর্যন্ত বীজের মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাকনা গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম, লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে; ধান, যব ইত্যাদি আশ্বিন কার্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে কর, একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে বড়ো ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা ও ছোটো ছোটো ডাল ছিঁড়িয়া চারি দিকে

পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? মনে কর, একটি বীজ সমস্ত দিন-রাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধুলা ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল। এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষ-শিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাহিরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষ-শিশুটি ঘুমাইয়া রহিল।

উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু

মৃত্তিকার নীচে অনেক দিন বীজ লুকাইয়া থাকে। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। তার পর বর্ষার আরম্ভে দুই-এক দিন বৃষ্টি হইল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, 'আর ঘুমাইয়ো না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্যের আলো দেখিবে।' আস্তে আস্তে বীজের ঢাক্‌নাটি খসিয়া পড়িল, দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া দৃঢ়রূপে মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয় শিশুটি যেন ছোটো মাথা তুলিয়া আশ্চর্যের সহিত নূতন দেশ দেখিতেছে।

গাছের অঙ্কুর বাহির হইলে যে অংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করে, তাহার নাম মূল। আর যে অংশ উপরের দিকে বাড়িতে থাকে, তাহাকে বলে কাণ্ড। সকল গাছেই 'মূল' আর 'কাণ্ড' এই দুই ভাগ দেখিবে। এই এক আশ্চর্যের কথা, গাছকে যেরূপেই রাখ, মূল নীচের দিকে ও কাণ্ড উপরের দিকে যাইবে। একটি টবে গাছ ছিল। পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েক দিন ধরিয়া টবটিকে উল্টা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলাম। গাছের মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিল, আর শিকড় উপরের দিকে

রহিল। দুই-এক দিন পরে দেখিতে পাইলাম যে, গাছ যেন টের পাইয়াছে। তাহার সব ডালগুলি বাঁকা হইয়া উপরের দিকে উঠিল ও মূলটি ঘুরিয়া নীচের দিকে নামিয়া গেল। তোমরা অনেকে শীতকালে অনেক বার মূলা কাটিয়া শয়তা করিয়া থাকিবে। দেখিয়াছ, প্রথমে শয়তার পাতাগুলি ও ফুল নীচের দিকে থাকে। কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যায়, পাতা ও ফুলগুলি উপর দিকে উঠিয়াছে।

আমরা যেরূপ আহার করি, গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিস খাইতে পারি। ছোটো ছোটো শিশুদের দাঁত নাই; তাহারা কেবল দুধ খায়। গাছেরও দাঁত নাই, সুতরাং তাহারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি হইতে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল ঢালিলে মাটির ভিতরের অনেক জিনিস গলিয়া যায়। গাছ সেই সব জিনিস আহার করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া যায়, ও গাছ মরিয়া যায়।

অণুবীক্ষণ দিয়া অতি ক্ষুদ্র পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল কিংবা মূল এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে। এইসব নল দ্বারা মাটি হইতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।

এ ছাড়া গাছের পাতা বাতাস হইতে আহার সংগ্রহ করে। পাতার মধ্যে অনেকগুলি ছোটো ছোটো মুখ আছে। অণুবীক্ষণ দিয়া এই সব মুখে ছোটো ছোটো ঠোঁট দেখা যায়। যখন আহার করিবার আবশ্যক হয় না তখন ঠোঁট দুইটি বুজিয়া যায়। আমরা যখন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন প্রশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়; তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। ইহা যদি পৃথিবীতে জমিতে থাকে তবে সকল জীবজন্তু অল্পদিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। বিধাতার করুণার কথা ভাবিয়া দেখ। যাহা জীবজন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহাই আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয়। গাছের পাতার উপর যখন সূর্যের আলোক পড়ে, তখন পাতাগুলি সূর্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া গাছকে বাড়াইতে থাকে। গাছেরা আলো চায়, আলো না হইলে ইহারা বাঁচিতে পারে না। গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা, কি করিয়া একটু আলো পাইবে। যদি জানালার কাছে টবে গাছ রাখ, তবে দেখিবে, সমস্ত ডালগুলি অন্ধকার দিক্ ছাড়িয়া আলোর দিকে যাইতেছে। বনে যাইয়া দেখিবে, গাছগুলি তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া কে আগে আলোক পাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। লতাগুলি ছায়াতে পড়িয়া থাকিলে আলোর অভাবে মরিয়া

খাইবে, এইজন্য তাহারা গাছ জড়াইয়া ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, আলোই জীবনের মূল। সূর্যের কিরণ শরীরে ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িতে থাকে। গাছের শরীরে সূর্যের কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে যে আলো ও তাপ বাহির হয়, তাহা সূর্যেরই তেজ। গাছ ও তাহার শস্য আলো ধরিবার ফাঁদ। জন্তুরা গাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে; গাছে যে সূর্যের তেজ আছে তাহা এই প্রকারে আবার জন্তুর শরীরে প্রবেশ করে। শস্য আহার না করিলে আমরাও বাঁচিতে পারিতাম না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমরাও আলো আহার করিয়া বাঁচিয়া আছি।

কোনো কোনো গাছ এক বৎসরের পরেই মরিয়া যায়। সব গাছই মরিবার পূর্বে সন্তান রাখিয়া যাইতে ব্যগ্র হয়। বীজগুলিই গাছের সন্তান। বীজ রক্ষা করিবার জন্য ফুলের পাপড়ি দিয়া গাছ একটি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করে। গাছ যখন ফুলে ঢাকিয়া থাকে, তখন কেমন সুন্দর দেখায়। মনে হয়, গাছ যেন হাসিতেছে। ফুলের ন্যায় সুন্দর জিনিস আর কি আছে? গাছ তো মাটি হইতে আহার লয়, আর বাতাস হইতে অঙ্গার আহরণ করে। এই সামান্য জিনিস দিয়া কি করিয়া এরূপ সুন্দর ফুল হইল? গল্পে শুনিয়াছি, স্পর্শমণি নামে এক প্রকার মণি আছে, তাহা ছোঁয়াইলে লোহা সোনা হইয়া যায়।

আমার মনে হয়, মাতার স্নেহই সেই মণি। সন্তানের উপর ভালোবাসাটাই যেন ফুলে ফুটিয়া উঠে। ভালোবাসার স্পর্শেই যেন মাটি এবং অঙ্গার ফুল হইয়া যায়।

গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিলে আমাদের মনে কত আনন্দ হয়! বোধ হয় গাছেরও যেন কত আনন্দ! আনন্দের দিনে আমরা দশজনকে নিমন্ত্রণ করি। ফুল ফুটিলে গাছও তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে ডাকিয়া আনে। গাছ যেন ডাকিয়া বলে 'কোথায় আমার বন্ধু-বান্ধব, আজ আমার বাড়িতে এসো। যদি পথ ভুলিয়া যাও, বাড়ি যদি চিনিতে না পার, সেজন্য নানা রঙের ফুলের নিশান তুলিয়া দিয়াছি। এই রঙিন পাপড়িগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইবে।' মৌমাছি ও প্রজাপতির সহিত গাছের চিরকাল বন্ধুতা। তাহারা দলে দলে ফুল দেখিতে আসে। কোনো কোনো পতঙ্গ দিনের বেলায় পাখির ভয়ে বাহির হইতে পারে না। পাখি তাহাদিগকে দেখিলেই খাইয়া ফেলে। কাজেই রাত্রি না হইলে তাহারা বাহির হইতে পারে না। সন্ধ্যা হইলেই তাহাদিগকে আনিবার জন্য ফুল চারি দিকে সুগন্ধ বিস্তার করে।

গাছ ফুলের মধ্যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছি ও প্রজাপতি সেই মধু পান করিয়া যায়। মৌমাছি আসে বলিয়া গাছেরও উপকার হয়। ফুলে তোমরা রেণু দেখিয়া থাকিবে। মৌমাছিরা এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে লইয়া যায়। রেণু ভিন্ন বীজ পাকিতে পারে না।

এইরূপে ফুলের মধ্যে বীজ পাকিয়া থাকে। শরীরের রস দিয়া গাছ বীজগুলিকে লালনপালন করিতে থাকে। নিজের জীবনের জন্য এখন আর মায়া করে না। তিল তিল করিয়া সন্তানের জন্য সমস্ত বিলাইয়া দেয়। যে শরীর কিছু দিন পূর্বে সতেজ ছিল, এখন তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইতে থাকে। শরীরের ভার বহন করিবারও আর শক্তি থাকে না। আগে বাতাস হু-হু করিয়া পাতা নড়াইয়া চলিয়া যাইত। পাতাগুলি বাতাসের সঙ্গে খেলা করিত; ছোটো ডালগুলি তালে তালে নাচিত। এখন শুষ্ক গাছটি বাতাসের ভর সহিতে পারে না। বাতাসের এক-একটি ঝাপ্‌টা লাগিলে গাছটি থর-থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। একটি একটি করিয়া ডালগুলি ভাঙিয়া পড়িতে থাকে। শেষে একদিন হঠাৎ গোড়া ভাঙিয়া গাছ মাটিতে পড়িয়া যায়।

এইরূপে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়া গাছ মরিয়া যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এই দ্বীপগুলি অতি ক্ষুদ্র প্রবাল-কীটের দেহ পঞ্জরে নির্মিত হইয়াছে। বহু সহস্র বৎসরে অগণ্য কীট নিজ নিজ দেহ দ্বারা এই দ্বীপগুলি নির্মাণ করিয়াছে।

আজকাল বিজ্ঞানের দ্বারা যে সব অসাধ্য সাধন হইতেছে, তাহাও বহু লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে। মানুষ পূর্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মনুষ্য বর্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা মনেও করিতে পারি না। কে প্রথমে আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, কে প্রথমে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে, প্রথমে যাঁহারা কোনো নূতন প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে অনেক নির্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরেও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাততঃ মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুইদিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাল-দ্বীপ যেরূপ একটু

একটু করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয়, জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনা বলিতেছি।

একশত বৎসর পূর্বে ইটালি দেশে গ্যাল্‌ভানি নামে একজন অধ্যাপক দেখিতে পাইলেন যে, লোহা ও তামার তার দিয়া একটা মরা ব্যাঙকে স্পর্শ করিলে ব্যাঙটা নড়িয়া উঠে। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া এই ঘটনাটির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া এত সময় অপব্যয় করিতে দেখিয়া, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। তাঁহার নাম হইল, 'ব্যাঙ-নাচানো' অধ্যাপক। বন্ধুরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মরা ব্যাঙ যেন নড়িল, কিন্তু ইহাতে লাভ কি?'

কি লাভ?—সেই যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিদ্যুতের বিবিধ গুণ সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। এই একশত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তির দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস যেন পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ দ্বারা পথ-ঘাট আলোকিত হইতেছে, গাড়ি চলিতেছে। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটি যেন আমাদের ঘরের কোণে আসিয়াছে— দূর আর দূর নাই। আমাদের স্বর বাড়ির এক দিক হইতে অন্য দিকে পৌঁছিত না। এখন বিদ্যুতের বলে সহস্র ক্রোশ দূরের বন্ধুর সহিত কথাবার্তা বলিতেছি। এমন-কি, এই শক্তির সাহায্যে দূর দেশে কি হইতেছে, তাহা পর্যন্ত দেখিতে

পাইব। আমাদের দৃষ্টি ও আমাদের স্বর আর কোনো বাধা মানিবে না।

মনুষ্য এ পর্যন্ত পৃথিবী এবং সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে; কিন্তু বহুদিন আকাশ জয় করিতে পারে নাই। ব্যোমযানে শূন্যে উঠা যায় বটে, কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে বেলুন চলিতে পারে না। আর এক অসুবিধা এই যে, বেলুন হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্যাস বাহির হইয়া যায়, এজন্য বেলুন অধিকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না।

রেশমের আবরণ হইতে গ্যাস বাহির হইয়া যায় বলিয়া, বেলুন অধিকক্ষণ আকাশে থাকিতে পারে না। সোয়ার্জ নামে একজন জার্মান এই জন্য আলুমিনিয়াম ধাতুর এক বেলুন প্রস্তুত করেন। আলুমিনিয়াম কাগজের ন্যায় হালকা, অথচ ইহা ভেদ করিয়া গ্যাস বাহির হইতে পারে না। বেলুন যে ধাতু-নির্মিত হইতে পারে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিল না। সোয়ার্জ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু বৎসর নিষ্ফল চেষ্টার পর অবশেষে বেলুন নির্মিত হইল। বেলুন যাহাতে ইচ্ছানুক্রমে বাতাসের প্রতিকূলে যাইতে পারে সেজন্য একটি ক্ষুদ্র এঞ্জিন প্রস্তুত করিলেন। জাহাজে জলের নীচে স্ক্রু থাকে, এঞ্জিনে স্ক্রু ঘুরাইলে জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে, সেইরূপ বাতাস কাটিয়া চলিবার জন্য একটি স্ক্রু নির্মাণ করিলেন। কিন্তু বেলুন নির্মিত হইবার অল্প পরেই

সোয়ার্জের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। যাহার জন্য সমস্ত সম্পত্তি ও জীবন পণ করিয়াছিলেন তিনি তাহার পরীক্ষা করিতে পারিলেন না, এতদিনের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে চলিল।

সোয়ার্জের সহধর্মিণী তখন জার্মান গবর্নমেণ্টের নিকট বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। জার্মান গবর্নমেণ্ট যুদ্ধে ব্যোমযান ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু সোয়ার্জের বেলুন যে কখনও আকাশে উঠিতে পারিবে কেহ তাহা বিশ্বাস করিত না। কেবল বিধবার দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া গবর্নমেণ্ট দয়া করিয়া বেলুনটা পরীক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ বিভাগের কতিপয় অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে বেলুন দেখিবার জন্য বহু লোক আসিল। পরীক্ষকেরা আসিয়া দেখিলেন, বেলুনটি অতি প্রকাণ্ড এবং ধাতুনির্মিত বলিয়া রেশমের বেলুন অপেক্ষা অনেক ভারী। তারপর বেলুন চালাইবার জন্য এঞ্জিন ও অনেক কল বেলুনে সংযুক্ত রহিয়াছে। এরূপ প্রকাণ্ড জিনিস কি কখনও আকাশে উঠিতে পারে! পরীক্ষকেরা একে অন্যের সহিত বলাবলি করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত কল কোনোদিনও পৃথিবী ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। লোকটা মরিয়া গিয়াছে, আর তাহার বিধবা অনেক আশা করিয়া দেখাইতে আসিয়াছে; সুতরাং অন্ততঃ নামমাত্র পরীক্ষা করিতে হইবে। তবে বেলুনের সহিত অতগুলি কল ও জঞ্জাল রহিয়াছে, ওগুলি কাটিয়া

বেলুনটিকে একটু পাতলা করিলে হয়তো ২।৪ হাত উঠিতে পারিবে। হায়! তাহাদিগকে বুঝাইবার কেহ ছিল না; বেলুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার স্বর আর শুনা যাইবে না! যে সব কল অনাবশ্যক বলিয়া কাটিয়া ফেলা হইল তাহা আবিষ্কার করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। ঐ সব কল দ্বারা বেলুনটিকে ইচ্ছানুসারে দক্ষিণে, বামে, ঊর্ধ্বে ও অধোদিকে চালিত করা যাইত।

ইহার পর আর এক বাধা পড়িল। সোয়ার্জের অবর্তমানে বেলুন কে চালাইবে? অপরে কি করিয়া কলের ব্যবহার বুঝিবে? সে যাহা হউক, দর্শকদিগের মধ্যে একজন এঞ্জিনিয়ার সাধ্যমত কল চালাইতে সম্মত হইলেন। অদূরে বিধবা কলের প্রত্যেক স্পন্দন গণিতেছিলেন। বেলুন পৃথিবী হইতে উঠিতে পারিবে কি? মৃত ব্যক্তির আশা ভরসা হয় এইবারে পূর্ণ হইবে, নতুবা একেবারে নির্মূল হইবে। কল চালানো হইল, অমনি বেলুন পৃথিবী ছাড়িয়া মহাবেগে শূন্যে উঠিল। তখন বাতাস বহিতেছিল, কিন্তু প্রতিকূল বাতাস কাটিয়া বেলুন ছুটিল। এতদিনে সোয়ার্জের চেষ্টা সফল হইল। কিন্তু লোকেরা যে সব কল অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, স্বল্প-কালের মধ্যেই তাহার আবশ্যকতা প্রমাণিত হইল। বেলুন আকাশে উঠিল বটে, কিন্তু তাহা সামলাইবার কল না থাকাতে অল্পক্ষণ পরেই ভূমিতে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু

এই দুর্দশাতে সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সোয়ার্জ যে অভিপ্রায়ে বেলুন নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা কোনোদিন হয়তো সফল হইবে। দশ বৎসরের মধ্যেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। জেপেলিন যে ব্যোমযান নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা যুদ্ধে ভীষণ অস্ত্র হইয়াছিল। যুদ্ধের পর এই ব্যোমযান আটলান্টিক মহাসাগর অনায়াসে পার হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ইয়োরোপ ও আমেরিকার ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে।

ব্যোমযান গ্যাস ভরিয়া লঘু করিতে হয়, সুতরাং আকারে অতি বৃহৎ এবং নির্মাণ করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। পাখিরা কি সহজেই উড়িয়া বেড়ায়! মানুষ কি কখনও পাখির মতো উড়িতে পারিবে? বড়ো বড়ো পাখিগুলি কেমন দুই-চারিবার পাখা নাড়িয়া শূন্যে উঠে, তাহার পর পাখা বিস্তার করিয়া চক্রাকারে আকাশে ঘুরিতে থাকে। ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে মিলিয়া যায়।

তোমাদের কি কখনও পাখির মতো উড়িবার ইচ্ছা হয় নাই? জর্মানি দেশে লিলিয়েনথাল মনে করিলেন, আমরা কেন পাখির মতো আকাশ ভ্রমণ করিতে পারিব না? তাহার পর পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতেন, এই বিদ্যা সাধন করিতে অনেক দিন লাগিবে। শিশু যেরূপ একটু একটু করিয়া অনেক চেষ্টায় হাঁটিতে শিখে, তাঁহাকেও সেইরূপ করিয়া উড়িতে শিখিতে হইবে। কিন্তু শিশু যেরূপ পড়িয়া গেলে আবার

উঠিতে চেষ্টা করে, আকাশ হইতে পড়িয়া গেলে আর তো উঠিবার সাধ্য থাকিবে না, মৃত্যু নিশ্চয়। এত বিপদ জানিয়াও তিনি পরীক্ষা হইতে বিরত হইলেন না। অনেক পরীক্ষার পর নানাপ্রকার পাখা প্রস্তুত করিলেন এবং সেগুলি বাহুতে বাঁধিয়া পাহাড় হইতে ঝাঁপ দিয়া, পাখায় ভর করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল যে, দুইখানা পাখার পরিবর্তে যদি অধিক সংখ্যক পাখা ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে হয়তো উড়িবার বেশি সুবিধা হইতে পারে। চেষ্টা করিয়া দেখিলেন তাহাই ঠিক।

ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত অতি সাবধানে তিনি এই সব পরীক্ষা করিতেছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া গিয়াছে, এজন্য তাঁহার কার্য শেষ করিতে তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। এখন যে কল প্রস্তুত করিলেন, তাড়াতাড়িতে তাহা পূর্বের মতো দৃঢ় হইল না। তিনি সেই অসম্পূর্ণ কল লইয়াই উড়িতে চেষ্টা করিলেন। এবার অতি সহজেই বাতাস কাটিয়া যাইতেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ বাতাসের ঝাপ্‌টা আসিয়া উপরের একখানা পাখা ভাঙিয়া দিল।

এই দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দ্বারা যে সব নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন তাহা পৃথিবীর সম্পত্তি হইয়া রহিল। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্যে পরে উড়িবার কল নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে। মার্কিন দেশে

অধ্যাপক ল্যাঙলি পাখাসংযুক্ত উড়িবার-কল প্রস্তুত করিলেন ; তাহাতে অতি হালকা একখানা এঞ্জিন সংযুক্ত ছিল। পরীক্ষার দিন অনেক লোক দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কর্মকারের শৈথিল্যবশতঃ একটি স্ক্রু ঢিলা হইয়াছিল। এঞ্জিন চালাইবার পর কল আকাশে উঠিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। এমন সময় ঢিলা স্ক্রুটি খুলিয়া গেল এবং কলটি নদীগর্ভে পতিত হইল। এই বিফলতার দুঃখে ল্যাঙলি ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা ভীরু তাঁহারাই বহু ব্যর্থ সাধনা ও মৃত্যুভয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। বীর পুরুষেরাই নির্ভীক চিত্তে মৃত্যু-ভয়ের অতীত হইতে সমর্থ হন। ল্যাঙলির মৃত্যুর পর তাঁহারই স্বদেশী উইলবার রাইট উড়িবার-কল লইয়া পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। উড়িবার সময় একবার কল থামিয়া যায় এবং আকাশ হইতে পতিত হইয়া রাইটের একখানা পা ভাঙিয়া যায়। ইহাতেও ভীত না হইয়া পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ গগনবিহারী হইয়া নীলাকাশে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সেতারের তার অঙ্গুলিতাড়নে ঝংকার দিয়া উঠে। দেখা যায়, তার কাঁপিতেছে। সেই কম্পনে বায়ুরাশিতে অদৃশ্য ঢেউ উৎপন্ন হয় এবং তাহার আঘাতে কর্ণেন্দ্রিয়ে সুর উপলব্ধি হয়। এইরূপে তিনের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরিত ও উপলব্ধ হইয়া থাকে— প্রথমতঃ শব্দের উৎস ঐ কম্পিত তার, দ্বিতীয়তঃ পরিবাহক বায়ু এবং তৃতীয়তঃ শব্দ-বোধক কর্ণেন্দ্রিয়।

সেতারের তার যতই ছোটো করা যায়, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তমে উঠিয়া থাকে। এইরূপে বায়ুস্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০০০ বার হইলে অসহ্য উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও খাটো করিলে সুর আর শুনিতে পাই না। তার তখনও কম্পিত হইতেছে, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় সেই অতি উচ্চ সুর উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রবণ করিবার উপরের দিকে যেরূপ এক সীমা আছে, নীচের দিকেও সেইরূপ। স্থূল তার কিংবা ইস্পাত আঘাত করিলে অতি ধীর স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো শব্দ শোনা যায় না। কম্পন-সংখ্যা ১৬ হইতে ৩০,০০০ পর্যন্ত হইলে তাহা শ্রুত হয়; অর্থাৎ আমাদের শ্রবণশক্তি একাদশ সপ্তকের মধ্যে আবদ্ধ। কর্ণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু অনেক সুর আমাদের নিকট অশব্দ।

বায়ুরাশির কম্পনে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, আকাশ

স্পন্দনেও সেইরূপ আলো উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু একাদশ সপ্তক সুর শুনিতে পাই। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা আরও অধিক; আকাশের অগণিত সুরের মধ্যে এক সপ্তক সুরমাত্র দেখিতে পাই। আকাশস্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে চারি শত লক্ষ কোটি বার হইলে চক্ষু তাহা রক্তিম আলো বলিয়া উপলব্ধি করে; কম্পন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হইলে বেগুনী রঙ দেখিতে পাই। পীত, সবুজ ও নীলালোক এই এক সপ্তকের অন্তর্ভুক্ত। কম্পন-সংখ্যা চারি শত লক্ষ কোটির ঊর্ধ্বে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হয় এবং দৃশ্য তখন অদৃশ্যে মিলাইয়া যায়।

আকাশ-স্পন্দনেই আলোর উৎপত্তি, তাহা দৃশ্যই হউক অথবা অদৃশ্যই হউক। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই অদৃশ্য রশ্মি কি করিয়া ধরা যাইতে পারে, আর এই রশ্মি যে আলো তাহার প্রমাণ কি? এ বিষয়ের পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জার্মান অধ্যাপক হার্টজ সর্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক উপায়ে আকাশে ঊর্মি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার ঢেউগুলি অতি বৃহদাকার বলিয়া সরল রেখায় ধাবিত না হইয়া বক্র হইয়া যাইত। দৃশ্য আলোক-রশ্মির সম্মুখে একখানি ধাতুফলক ধরিলে পশ্চাতে ছায়া পড়ে; কিন্তু আকাশের বৃহদাকার ঢেউগুলি ঘুরিয়া বাধার পশ্চাতে পৌঁছিয়া থাকে। জলের বৃহৎ ঊর্মির সম্মুখে উপলখণ্ড ধরিলে এইরূপ হইতে দেখা যায়। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর

প্রকৃতি যে একই তাহা সূক্ষ্মরূপে প্রমাণ করিতে হইলে অদৃশ্য আলোর ঊর্মি খর্ব করা আবশ্যক। আমি যে কল নির্মাণ করিয়াছিলাম তাহা হইতে উৎপন্ন আকাশোর্মির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই কলে একটি ক্ষুদ্র লণ্ঠনের ভিতরে তড়িতোর্মি উৎপন্ন হয়। এক দিকে একটি খোলা নল; তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলো বাহির হয়। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয়তো অন্য কোনো জীবে দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই আলোকে উদ্ভিদ্ উত্তেজিত হইয়া থাকে।

অদৃশ্য আলো দেখিবার জন্য কৃত্রিম চক্ষু নির্মাণ করা আবশ্যক। আমাদের চক্ষুর পশ্চাতে স্নায়ু-নির্মিত একখানি পর্দা আছে; তাহার উপর আলো পতিত হইলে স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কের বিশেষ অংশকে আলোড়িত করে এবং সেই আলোড়ন আলো বলিয়া অনুভব করি। কৃত্রিম চক্ষুর গঠন খানিকটা ঐরূপ। দুইখানি ধাতুখণ্ড পরস্পরের সহিত স্পর্শ করিয়া আছে। সংযোগস্থলে অদৃশ্য আলো পতিত হইলে সহসা আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে বিদ্যুৎস্রোত বহিয়া চুম্বকের কাঁটা নাড়িয়া দেয়। বোবা যেরূপ হাত নাড়িয়া সংকেত করে, অদৃশ্য আলো দেখিতে পাইলে কৃত্রিম চক্ষুও সেইরূপ কাঁটা নাড়িয়া আলোর উপলব্ধি জ্ঞাপন করে।

আলোর সাধারণ প্রকৃতি

এখন দেখা যাউক, দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একবিধ অথবা বিভিন্ন। দৃশ্য আলোকের প্রকৃতি এই যে—

১. ইহা সরল রেখায় ধাবিত হয়।

২. ধাতুনির্মিত দর্পণে পতিত হইলে আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। রশ্মি প্রতিফলিত হইবারও একটা বিশেষ নিয়ম আছে।

৩. আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য আলো-আহত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ পরিবর্তিত হয়। ফোটোগ্রাফের প্লেটে যে ছবি পড়ে তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং ডেভেলপার ঢালিলে ছবি ফুটিয়া উঠে।

৪. সব আলোর রঙ এক নহে ; কোনো আলো লাল, কোনোটা পীত, কোনোটা সবুজ এবং কোনোটা নীল। বিভিন্ন পদার্থ নানা রঙের পক্ষে স্বচ্ছ কিংবা অস্বচ্ছ।

৫. আলো বায়ু হইতে অন্য কোনো স্বচ্ছ পদার্থের উপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। আলোর রশ্মি ত্রিকোণ কাচের উপর ফেলিলে ইহা স্পষ্টত দেখা যায়। কাচ-বর্তুলের ভিতর দিয়া আলো অক্ষীণভাবে দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

৬. আলোর ঢেউয়ে সচরাচর কোনো শৃঙ্খলা নাই ; উহা সর্বমুখী ; অর্থাৎ কখনও উর্ধ্বাধঃ কখনও বা দক্ষিণে বামে স্পন্দিত হয়। স্ফটিকজাতীয় পদার্থ দ্বারা আলোক-রশ্মির

স্পন্দন শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে; তখন স্পন্দন বহুমুখী না হইয়া একমুখী হয়। একমুখী আলোর বিশেষ ধর্ম পরে বলিব।

দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই রূপ, এক্ষণে সেই পরীক্ষা বর্ণনা করিব।

প্রথমতঃ, অদৃশ্য আলোক যে সোজা পথে চলে তাহার প্রমাণ এই যে, বিদ্যুতোর্মি বাহির হইবার জন্য লণ্ঠনে যে নল আছে সেই নলের সম্মুখে সোজা লাইনে কৃত্রিম চক্ষু ধরিলে কাঁটা নড়িয়া উঠে। চক্ষুটিকে এক পাশে ধরিলে কোনো উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যায় না।

দর্পণে যেরূপ দৃশ্য আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে এবং সেই প্রত্যাবর্তন যে নিয়মাধীন, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপে এবং সেই নিয়মে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্তন করে।

দৃশ্য আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। অদৃশ্য আলোকও যে আণবিক পরিবর্তন ঘটায় তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আলোর বিবিধ বর্ণ

পূর্বে বলিয়াছি যে, দৃশ্য আলোক নানা বর্ণের। অনুভূতির দ্বারা বর্ণের বিভিন্নতা সহজেই ধরিতে পারি; কিন্তু বর্ণের বিভিন্নতা অনেকেই ধরিতে পারেন না। তাঁহারা বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধ। বর্ণের বিভিন্নতা অন্য উপায়ে ধরা যাইতে পারে; সে

বিষয় পরে বলিব। এইখানে বলা আবশ্যক যে, মানুষের দৃষ্টি-সীমার ক্রমবিকাশ হইতেছে। বহু পূর্বপুরুষদের বর্ণজ্ঞান সংকীর্ণ ছিল, তাহা অন্ততঃ এক দিকে প্রসারিত হইয়াছে। আর অন্য দিকেও কোনোদিন প্রসারিত হইবে। তাহা হইলে এখন যাহা অদৃশ্য তখন তাহা দৃশ্যের মধ্যে আসিবে।

সে যাহা হউক, অদৃশ্য আলোর রঙ সম্বন্ধে কয়েকটি অদ্ভুত পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জানালার কাচের কোনো বিশেষ রঙ নাই, সূর্যের আলো উহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়। সুতরাং দৃশ্য আলোর পক্ষে কাচ স্বচ্ছ, জলও স্বচ্ছ। কিন্তু ইট-পাটকেল অস্বচ্ছ, আলকাতরা তদপেক্ষা অস্বচ্ছ। দৃশ্য আলোকের কথা বলিলাম। অদৃশ্য আলোকের সম্মুখে জানালার কাচ ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া এইরূপ আলো সহজেই চলিয়া যায়। কিন্তু জলের গেলাস সম্মুখে ধরিলে অদৃশ্য আলো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! তদপেক্ষাও আশ্চর্যের বিষয় আছে। ইট-পাটকেল, যাহা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে করিতাম তাহা অদৃশ্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছ। আর আলকাতরা? ইহা জানালার কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ! কোথায় এক অদ্ভুত দেশের কথা পড়িয়াছিলাম; সে দেশে জলাশয় হইতে মৎস্যেরা ডাঙায় ছিপ ফেলিয়া মানুষ শিকার করে। অদৃশ্য আলোকের কার্যও যেন অনেকটা সেইরূপই অদ্ভুত হইবে।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দৃশ্য আলোকেও এরূপ আশ্চর্য

ঘটনা দেখিয়াছি; তাহাতে অভ্যস্ত বলিয়া বিস্মিত হই না। সম্মুখের সাদা কাগজের উপর দুইটি বিভিন্ন আলো-রেখা পতিত হইয়াছে; একটি লাল আর একটি সবুজ। মাঝখানে জানালার কাচ ধরিলে উভয় আলোই অবাধে ভেদ করিয়া যায়। এবার মাঝখানে লাল কাচ ধরিলাম; লাল আলো অবাধে যাইতেছে, কিন্তু সবুজ আলো বন্ধ হইল। সবুজ কাচ ধরিলে সবুজ আলো বাধা পাইবে না; কিন্তু লাল আলো বন্ধ হইবে। ইহার কারণ এই যে, ১. সব আলো এক বর্ণের নহে; ২. কোনো পদার্থ এক আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু অন্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ। যদি বর্ণজ্ঞান না থাকিত তাহা হইলেও একই পদার্থের ভিতর দিয়া এক আলো যাইতেছে এবং অন্য আলো যাইতেছে না দেখিয়া নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতাম যে, দুইটি আলো বিভিন্ন বর্ণের। আলকাতরা দৃশ্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ এবং অদৃশ্য আলোর পক্ষে স্বচ্ছ, ইহা জানিয়া অদৃশ্য আলোক যে অন্য বর্ণের তাহা প্রমাণিত হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইলে ইন্দ্রধনু অপেক্ষাও কল্পনাতীত অনেক নূতন বর্ণের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতাম। তাহাতেও কি আমাদের বর্ণের তৃষ্ণা মিটিত?

মৃত্তিকা-বর্তুল ও কাঁচ-বর্তুল

পূর্বে বলিয়াছি যে, আলো এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য স্বচ্ছ বস্তুর উপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। ত্রিকোণ কাচ কিংবা

ত্রিকোণ ইষ্টকখণ্ড দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য আলো যে একই নিয়মের অধীন, তাহা প্রমাণ করা যায়। কাচ-বর্তুল সাহায্যে দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুদূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপে প্রেরণ করা যায়। তবে এজন্য বহুমূল্য কাচ-বর্তুল নিষ্প্রয়োজন, ইট-পাটকেল দিয়াও এইরূপ বর্তুল নির্মিত হইতে পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে যে ইষ্টকনির্মিত গোল স্তম্ভ আছে তাহা দিয়া অদৃশ্য আলো দূরে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। দৃশ্য আলো সংহত করিবার পক্ষে হীরকখণ্ডের অদ্ভুত ক্ষমতা। বস্তুবিশেষের আলো সংহত করিবার ক্ষমতা যেরূপ অধিক, আলো বিকিরণ করিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে বহুল হইয়া থাকে। এই কারণেই হীরকের এত মূল্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চীনা-বাসনের অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার ক্ষমতা হীরক অপেক্ষাও অনেকগুণ অধিক। সুতরাং যদি কোনোদিন আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইয়া রক্তিম বর্ণের সীমা পার হয় তবে হীরক তুচ্ছ হইবে এবং চীনা-বাসনের মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িবে। প্রথমবার বিলাত যাইবার সময় অভ্যস্ত কুসংস্কার হেতু চীনাবাসন স্পর্শ করিতে ঘৃণা হইত। বিলাতে সম্ভ্রান্ত ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিলাম যে, দেওয়ালে বহুবিধ চীনা-বাসন সাজানো রহিয়াছে। ইহার এমন কি মূল্য যে, এত যত্ন? প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি ইংরেজ ব্যবসাদার। অদৃশ্য আলো দৃশ্য হইলে চীনা-বাসন অমূল্য

হইয়া যাইবে। তখন তাহার তুলনায় হীরক কোথায় লাগে! সেদিন শৌখিন রমণীগণ হীরকমালা প্রত্যাখ্যান করিয়া পেয়ালা-পিরিচের মালা সগর্বে পরিধান করিবেন এবং অচীনধারিণী নারীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন।

সর্বমুখী এবং একমুখী আলো

প্রদীপের অথবা সূর্যের আলো সর্বমুখী; অর্থাৎ স্পন্দন একবার উর্ধ্বাধঃ অন্যবার দক্ষিণে বামে হইয়া থাকে। লঙ্কাদ্বীপের টুর্মালিন স্ফটিকের ভিতর দিয়া আলো প্রেরণ করিলে আলো একমুখী হইয়া যায়। দুইখানি টুর্মালিন সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়া ভেদ করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু একখানি অন্যখানির উপর আড়ভাবে ধরিলে আলো উভয়ের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না।

অদৃশ্য আলোকও এইরূপে একমুখী করা যাইতে পারে। কিরূপে তাহা হয় বুঝাইতে হইলে নীতি-কথার বক ও শৃগালের গল্প স্মরণ করা আবশ্যক। বক শৃগালকে নিমন্ত্রণ করিয়া পানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিল। লম্বা বোতলে পানীয় দ্রব্য রক্ষিত ছিল। বক লম্বা ঠোঁট দিয়া অনায়াসে পান করিল; কিন্তু শৃগাল কেবলমাত্র সৃক্কণী লেহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরের দিন শৃগাল ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিল। পানীয় দ্রব্য থালাতে দেওয়া হইয়াছিল। বক

ঠোঁট কাৎ করিয়াও কোনো প্রকারেই পানীয় শোষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। বোতল ও থালার দ্বারা যেরূপে লম্বা ঠোঁট এবং চেপ্‌টা মুখের বিভিন্নতা বুঝা যায়, সেইরূপ একমুখী আলোকের পার্থক্য ধরা যাইতে পারে, তাহা লম্বা কিংবা চেপ্‌টা— ঊর্ধ্বাধঃ অথবা এ-পাশ ও-পাশ।

বক-কচ্ছপ সংবাদ

মনে কর, দুই দল জন্তু মাঠে চরিতেছে— লম্বা জানোয়ার বক ও চেপ্‌টা জীব কচ্ছপ। সর্বমুখী অদৃশ্য আলোকও এইরূপ দুই প্রকারের স্পন্দনসঞ্জাত। দুই প্রকারের জীবদিগকে বাছিবার সহজ উপায়, সম্মুখে লোহার গরাদ খাড়াভাবে রাখিয়া দেওয়া। জন্তুদিগকে তাড়া করিলে লম্বা বক সহজেই পার হইয়া যাইবে ; কিন্তু চেপ্‌টা কচ্ছপ গরাদের এ-পাশে থাকিবে। প্রথম বাধা পার হইবার পর বকবৃন্দের সম্মুখে যদি দ্বিতীয় গরাদ সমান্তরালভাবে ধরা যায়, তাহা হইলেও বক তাহা দিয়া গলিয়া যাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদখানাকে যদি আড়ভাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বক আটকাইয়া থাকিবে। এইরূপে একটি গরাদ অদৃশ্য আলোর সম্মুখে ধরিলে আলো একমুখী হইবে। দ্বিতীয় গরাদ সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো উহার ভিতর দিয়াও যাইবে, তখন দ্বিতীয় গরাদটা আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদটা আড়ভাবে ধরিলে আলো যাইতে

পারিবে না, তখন গরাদটা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। যদি আলো একমুখী হয় তাহা হইলে কোনো কোনো বস্তু একভাবে ধরিলে অস্বচ্ছ হইবে ; কিন্তু ৯০ ডিগ্রি ঘুরাইয়া ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারিবে।

পুস্তকের পাতাগুলি গরাদের মতো সজ্জিত। বিলাতে রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউসনে বক্তৃতা করিবার সময় টেবিলের উপর একখানা রেলের টাইম-টেব্‌ল্‌, অর্থাৎ ব্রাড্‌শ ছিল, তাহাতে ১০ হাজার ট্রেনের সময়, রেল-ভাড়া এবং অন্যান্য বিষয় ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত ছিল। উহা এরূপ জটিল যে, কাহারও সাধ্য নাই ইহা হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় বাহির করিতে পারে। আমি পুস্তকের তমসাচ্ছন্নতা কিছু না মনে করিয়া পরীক্ষার সময় দেখাইয়াছিলাম যে, বইখানাকে এরূপ করিয়া ধরিলে ইহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারে না ; কিন্তু ৯০ ডিগ্রি ঘুরাইয়া ধরিলে পুস্তকখানা একেবারে স্বচ্ছ হইয়া যায়। পরীক্ষা দেখাইবামাত্র হাসির রোলে হল্‌ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রথম প্রথম রহস্য বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম। লর্ড রেলী আসিয়া বলিলেন যে, ব্রাড্‌শর ভিতর দিয়া এ পর্যন্ত কেহ আলোক দেখিতে পায় নাই। কি করিয়া ধরিলে আলো দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা শিখাইলে জগৎবাসী আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবে। আমার বৈজ্ঞানিক লেখা পড়িয়া কেহ কেহ স্তম্ভিত হইবেন, দন্তস্ফুট অথবা চক্ষুস্ফুট করিতে সমর্থ হইবেন না। তাহা হইলে

বইখানাকে ৯০ ডিগ্রি ঘুরাইয়া ধরিলেই সব তথ্য একবারে বিশদ হইবে।

আলো একমুখী করিবার অন্য এক উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যদিও এলোমেলোভাবে আকাশ-স্পন্দন রমণীর কেশগুচ্ছে প্রবেশ করে, তথাপি বাহির হইবার সময় একবারে শৃঙ্খলিত হইয়া থাকে। বিলাতের নরসুন্দরদের দোকান হইতে বহু জাতির কেশগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ফরাসী মহিলার নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল বিশেষ কার্যকরী। এ বিষয়ে জার্মান মহিলার স্বর্ণাভ কুন্তল অনেকাংশে হীন। প্যারিসে যখন এই পরীক্ষা দেখাই তখন সমবেত ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলী এই নূতন তত্ত্ব দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বৈরী জাতির উপর তাহাদের প্রাধান্য প্রমাণিত হইয়াছে, ইহার কোনো সন্দেহই রহিল না। বলা বাহুল্য, বার্লিনে এই পরীক্ষা প্রদর্শনে বিরত হইয়াছিলাম।

যে সব পরীক্ষা বর্ণনা করিলাম তাহা হইতে দেখা যায় যে, দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রস্তুতি একই, আমাদের দৃষ্টি-শক্তির অসম্পূর্ণতা হেতু উহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া মনে করি।

তারহীন সংবাদ

অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘর-বাড়ি ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ

প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউনহলে এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্নর স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ-ঊর্মি তাঁহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদস্তূপ উড়াইয়া দিল। ১৯০৭ সালে মার্কনি তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উন্নতিসাধনে কৃতিত্বের দ্বারা পৃথিবীতে এক নূতন যুগ প্রবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর ব্যবধান একেবারে ঘুচিয়াছে। পূর্বে দূর দেশে কেবল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরিত হইত, এখন বিনা তারে সর্বত্র সংবাদ পৌছিয়া থাকে।

কেবল তাহাই নহে। মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও বিনা তারে আকাশতরঙ্গ সাহায্যে সুদূরে শ্রুত হইতেছে। সেই স্বর সকলে শুনিতে পায় না, শুনিতে হইলে কর্ণ আকাশের সুরের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়। এইরূপে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অহোরাত্রি কথাবার্তা চলিতেছে। কান পাতিয়া তবে একবার শোনো। 'কোথা হইতে খবর পাঠাইতেছ ?' উত্তর— 'সমুদ্র-গর্ভে, তিন শত হাত নীচে ডুবিয়া আছি। টর্পিডো দিয়া তিনখানা রণতরী ডুবাইয়াছি,

আর দুইখানার প্রতীক্ষায় আছি।' আবার এ কি ? একেবারে লক্ষ লক্ষ কামানের গর্জন শোনা যাইতেছে, অগ্ন্যুৎপাতে যেন মেদিনী বিদীর্ণ হইল। পরে জানিলাম মহাসাম্রাজ্য চূর্ণ হইয়াছে, কল্য হইতে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হইবে। এই ভীষণ নিনাদের মধ্যেও মনুষ্য-কণ্ঠের কত মর্মবেদনাধ্বনি, কত মিনতি, কত জিজ্ঞাসা ও কত রকমের উত্তর শোনা যায়। ইহার মধ্যে কে একজন অবুঝের মতো বার বার একই নাম ধরিয়া ডাকিতেছে— 'কোথায় তুমি— কোথায় তুমি ?' কোনো উত্তর আসিল না— সে আর এই পৃথিবীতে নাই।

এইরূপ দূরদূরান্ত বাহিয়া আকাশের স্বর ধ্বনিত হইতেছে। মনে কর, কোনো অদৃশ্য অঙ্গুলি বৈদ্যুতিক অর্গ্যানের বিবিধ স্টপ আঘাত করিতেছে। বাম দিকের স্টপে আঘাত করাতে এক সেকেণ্ডে একটি স্পন্দন হইল। অমনি শূন্যমার্গে বিদ্যুৎ-ঊর্মি ধাবিত হইল। কি প্রকাণ্ড সেই সহস্র ক্রোশব্যাপী ঢেউ! উহা অনায়াসে হিমাচল উল্লঙ্ঘন করিয়া এক সেকেণ্ডে পৃথিবী দশবার প্রদক্ষিণ করিল। এবার অদৃশ্য অঙ্গুলি দ্বিতীয় স্টপ আঘাত করিল। এইবার প্রতি সেকেণ্ডে আকাশ দশবার স্পন্দিত হইল। এইরূপে আকাশের সুর ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতরে উঠিবে ; স্পন্দনসংখ্যা এক হইতে দশ, শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি গুণ বৃদ্ধি পাইবে। আকাশ-সাগরে নিমজ্জমান রহিয়া আমরা অগণিত ঊর্মি দ্বারা আহত হইব, কিন্তু ইহাতেও কোনো ইন্দ্রিয়

জাগরিত হইবে না। আকাশ-স্পন্দন আরও উর্ধ্বে উঠুক তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য তাপ অনুভূত হইবে। তাহার পর চক্ষু উত্তেজিত হইয়া রক্তিম, পীতাদি আলোক দেখিতে পাইবে। এই দৃশ্য আলোক এক সপ্তক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সুর আরও উচ্চে উঠিলে দৃষ্টিশক্তি পুনরায় পরাস্ত হইবে, অনুভূতি শক্তি আর জাগিবে না, ক্ষণিক আলোকের পরই অভেদ্য অন্ধকার।

তবে তো আমরা এই অসীমের মধ্যে একেবারে দিশাহারা, কতটুকুই বা দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর! অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরিতেছি এবং ভগ্ন দিক্-শলাকা লইয়া পাহাড় লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হে অনন্ত পথের যাত্রী, কি সম্বল তোমার?

সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস; যে বিশ্বাস-বলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সাম্রাজ্য এইরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই একটি ক্ষীণ আলো-রেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়-বলে ঘন কুয়াশা অপসারিত হইবে এবং একদিন বিশ্বজগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে।

পলাতক তুফান

বৈজ্ঞানিক রহস্য

কয়েক বৎসর পূর্বে এক অত্যাশ্চর্য ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে এবং এ বিষয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিবিধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় অনেক লেখালেখি চলিয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কিছু মীমাংসা হয় নাই।

২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার ইংরাজী সংবাদপত্রে সিমলা হইতে এক তারের সংবাদ প্রকাশ হয়—

সিমলা, হাওয়া আপিস ২৭শে সেপ্টেম্বর। "বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা।"

২৯শে তারিখের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল— হাওয়া আপিস আলিপুর। "দুই দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। ডায়মণ্ড-হারবারে এই মর্মে নিশান উত্থিত করা হইয়াছে।"

৩০শে তারিখে যে খবর প্রকাশিত হইল তাহা অতি ভীতিজনক—

"আধঘণ্টার মধ্যে চাপমান যন্ত্র দুই ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে। আগামী কল্য ১০ ঘটিকার মধ্যে কলিকাতায় অতি প্রচণ্ড ঝড় হইবে; এরূপ তুফান বহু বৎসরের মধ্যে হয় নাই।"

কলিকাতার অধিবাসীরা সেই রাত্রি কেহই নিদ্রা যায় নাই।

আগামীকল্য কি হইবে তাহার জন্য সকলে ভীত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

১লা অক্টোবর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

সমস্ত দিন মেঘাবৃত ছিল, কিন্তু বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। ঝড়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

তার পর-দিন হাওয়া আপিস খবরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"কলিকাতায় ঝড় হইবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে প্রতিহত হইয়া ঝড় অন্য অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।"

ঝড় কোন্ দিকে গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য দিক্-দিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল; কিন্তু তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর সর্বপ্রধান ইংরাজী কাগজ লিখিলেন—এত-দিনে বুঝা গেল যে, বিজ্ঞান সর্বৈব মিথ্যা।

অন্য কাগজে লেখা হইল, যদি তাহাই হয় তবে গরিব ট্যাক্সদাতাদিগকে পীড়ন করিয়া হাওয়া আপিসের ন্যায় অকর্মণ্য আপিস রাখিয়া লাভ কি?

তখন বিবিধ সংবাদপত্র তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—উঠাইয়া দাও।

গবর্নমেণ্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অল্প দিন পূর্বে হাওয়া আপিসের জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার আনানো হইয়াছে। সেগুলি এখন ভাঙা শিশি বোতলের মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর হাওয়া আপিসের বড়ো সাহেবকে অন্য কি কার্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে?

গবর্নমেণ্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে লিখিয়া পাঠাইলেন— "আমরা ইচ্ছা করি ভেষজবিদ্যার এক নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। তিনি বায়ুর চাপের সহিত মানুষের স্বাস্থ্যসম্বন্ধ-বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।"

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ লিখিয়া পাঠাইলেন— "উত্তম কথা, বায়ুর চাপ কমিলে ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। তাহাতে সচরাচর আমাদের যে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে পারে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে কলিকাতাবাসীরা আপাততঃ বহুবিধ চাপের নীচে আছে :

১ম	বায়ু	প্রতি বর্গইঞ্চি	১৫ পাউণ্ড
২য়	ম্যালেরিয়া	..	২০ ..
৩য়	পেটেণ্ট ঔষধ	..	৩০ ..
৪র্থ	ইউনিভার্সিটি	..	৫০ ..
৫ম	ইন্‌কম ট্যাক্স	..	৮০ ..
৬ষ্ঠ	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	..	১ টন

বায়ুর ২।১ ইঞ্চি চাপের ইতর বৃদ্ধি 'বোঝার উপর শাকের

আঁটি' স্বরূপ হইবে। সুতরাং কলিকাতায় এই নূতন অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে বিশেষ যে উপকার হইবে এরূপ বোধ হয় না।

তবে সিমলা পাহাড়ে বায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে উক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।"

ইহার পর গবর্নমেণ্ট নিরুত্তর হইলেন। হাওয়া আপিস এবারকার মতো অব্যাহতি পাইল।

কিন্তু যে সমস্যা লইয়া এত গোল হইল তাহা পূরণ হইল না।

একবার কোনো বৈজ্ঞানিক বিলাতের 'নেচার' কাগজে লিখিয়াছিলেন বটে ; তাঁহার থিয়োরি এই যে, কোনো অদৃশ্য ধূমকেতুর আকর্ষণে আবর্তমান বায়ুরাশি উর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে।

এসব অনুমান মাত্র। এখনও এ বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। অক্সফোর্ডে যে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসনের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে এক অতি বিখ্যাত জার্মান অধ্যাপক 'পলাতক তুফান' সম্বন্ধে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধারম্ভে অধ্যাপক বলিলেন, তুফান বায়ুমণ্ডলের আবর্তমাত্র। সর্বাগ্রে দেখা যাউক, কিরূপে বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী যখন ফুটন্ত ধাতুপিণ্ডরূপে সূর্য হইতে ছুটিয়া আসিল তখন বায়ুর উৎপত্তি হয় নাই। কি করিয়া অম্লজান, দ্ব্যম্লজান ও উদ্‌জানের উৎপত্তি হইল তাহা

সৃষ্টির এক গভীর প্রহেলিকা! যবক্ষারজানের উৎপত্তি আরও বিস্ময়কর। ধরিয়া লওয়া যাউক, কোনো প্রকারে বায়ুরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। গুরুতর সমস্যা এই যে, কি কারণে বায়ু শূন্যে মিলাইয়া যায় না। ইহার মূল কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে পদার্থের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি কিংবা কম। যাহা গুরু তাহার উপরেই টান বেশি এবং তাহা সেই পরিমাণে আবদ্ধ। হালকা জিনিসের উপর টান কম, তাহা অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত। এই কারণে তৈল ও জল মিশ্রিত করিলে লঘু তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। উদ্‌জান হালকা গ্যাস বলিয়া অনেক পরিমাণে উন্মুক্ত এবং উপরে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টান একেবারে এড়াইতে পারে না। আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক সত্য বর্ণিত হইল তাহা যে পৃথিবীর সর্বস্থানে প্রযোজ্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; কারণ ইণ্ডিয়া নামক দেশে যদিও পুরুষজাতি গুরু তথাপি তাহারা উন্মুক্ত, আর লঘু স্ত্রীজাতিই সে দেশে আবদ্ধ!

সে যাহা হউক, পদার্থমাত্রেই মাধ্যাকর্ষণবলে ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ থাকে। পদার্থের মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র কথা। মানুষ মরিয়া যখন ভূত হয় তখন তাহার উপর পৃথিবীর আর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। কেহ কেহ বলেন, মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই; কারণ ভূতদিগকেও থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির আজ্ঞানুসারে চলাফেরা করিতে হয়। পদার্থও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—

পদার্থ সম্বন্ধে পঞ্চত্ব কথা প্রয়োগ করা ভুল ; কারণ রেডিয়ামের গুতা খাইয়া পদার্থ ত্রিত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আল্‌ফা, বিটা ও গামা এই তিন ভূতে পরিণত হয়। এইরূপে পদার্থের অস্তিত্ব যখন লোপ হয় তখন অপদার্থ শূন্যে মিলিয়া যায়। কিন্তু যতদিন পার্থিব পদার্থ জীবিত থাকে ততদিন পৃথিবী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারে না।

যদিও অধ্যাপক মহাশয়, পদার্থ কেন পলায়ন করে না, এ সম্বন্ধে অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিলেন, তথাপি তুফান কেন পলায়ন করিল, এ সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

এই ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে একজন মাত্র জানে—সে আমি।

পরের অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গত বৎসর আমার বিষম জ্বর হইয়াছিল। প্রায় মাসেক কাল শয্যাগত ছিলাম।

ডাক্তার বলিলেন—সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে লঙ্কাদ্বীপ যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তলরাশি একান্ত বিরল হইয়াছিল। একদিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দ্বীপ কাহাকে বলে?" আমার কন্যা ভূগোল-তত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার উত্তর পাইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিল "এই দ্বীপ"— ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিরল-কেশ মসৃণ মস্তকে দুই এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তার পর বলিল, "তোমার ব্যাগে এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী' দিয়াছি; জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও, নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দুই একটি দ্বীপের চিহ্নও থাকিবে না।" 'কুন্তল-কেশরী'র আবিষ্কার এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। সার্কাস দেখাইবার জন্য বিলাত হইতে এ দেশে এক ইংরেজ আসিয়াছিল। সেই সার্কাসে কৃষ্ণ কেশর-ভূষিত সিংহই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য দৃশ্য ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজে আসিবার সময় আণুবীক্ষণিক কীটের দংশনে সমস্ত কেশরগুলি খসিয়া যায় এবং এ দেশে পৌঁছিবার পর সিংহ এবং লোমহীন কুকুরের বিশেষ পার্থক্য রহিল না। নিরুপায় হইয়া সার্কাসের অধ্যক্ষ এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইল এবং পদধূলি লইয়া জোড়হস্তে বর প্রার্থনা করিল। একে ম্লেচ্ছ, তাহাতে সাহেব! ভক্তের বিনয় ব্যবহারে সন্ন্যাসী একেবারে মুগ্ধ হইলেন এবং বরস্বরূপ স্বপ্নলব্ধ অব-ধৌতিক তৈল দান করিলেন। পরে উক্ত তৈল 'কুন্তল-কেশরী' নামে জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছে। তৈল প্রলেপে এক সপ্তাহের মধ্যেই সিংহের লুপ্ত কেশর গজাইয়া উঠিল। কেশহীন মানব

এবং তস্য ভার্যার পক্ষে উক্ত তৈলের শক্তি অমোঘ। লোক-হিতার্থেই এই শুভ সংবাদ দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এমন-কি, অতি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সর্বপ্রথম পৃষ্ঠায় এই অদ্ভুত আবিষ্কার বিঘোষিত হইয়া থাকে।

২৮শে তারিখে আমি চুসান জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। প্রথম দুই দিন ভালোরূপেই গেল। ১লা তারিখ প্রত্যূষে সমুদ্র এক অস্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিল, বাতাস একেবারে বন্ধ হইল। সমুদ্রের জল পর্যন্ত সীসার রঙের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন, "যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতি সত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কূল হইতে বহু দূরে— এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর ভীতিসূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারি দিক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হইল এবং দূর হইতে এক এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তার পর মুহূর্তমধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে। কোথা হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উদ্যত হইল।

বায়ুর গর্জনের সহিত সমুদ্র স্বীয় মহাগর্জনের সুর মিলাইয়া সংহার মূর্তি ধারণ করিল।

তার পর অনন্ত ঊর্মিরাশি, একের উপর অন্যে আসিয়া একেবারে জাহাজ আক্রমণ করিল।

এক মহা ঊর্মি জাহাজের উপর পতিত হইল এবং মাস্তুল, লাইফ-বোট ভাঙিয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে জীবনের স্মৃতি যেরূপ জাগিয়া উঠে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য এই, আমার কন্যা আমার বিরল কেশ লইয়া যে উপহাস করিয়াছিল, এই সময়ে তাহা পর্যন্ত স্মরণ হইল—

'বাবা, এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী' তোমার ব্যাগে দিয়াছি।'

হঠাৎ এক কথায় আর এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে, এ বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনি আমার ব্যাগ হইতে তৈলের শিশি খুলিয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ টলমল করিতেছিল।

উপরে উঠিয়া দেখি, সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বতপ্রমাণ ফেনিল এক মহা ঊর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া 'কুন্তল-

কেশরী' বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া শিশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; মুহূর্তমধ্যে তৈল সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈল স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই এবং এই কারণেই সেই ঘোর ঝাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল তৈলের সাহায্যে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

১৮১৪ খৃস্টাব্দে ইংরেজ গবর্নমেণ্ট নেপাল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জেনারেল মালি কাটামুণ্ডু আক্রমণের জন্য প্রেরিত হইলেন। জেনারেল উড গোরক্ষপুরে ছাউনি করিয়া তরাই প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। জেনারেল অক্টারলোনি নেপাল রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে অমরসিংহের সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন ; আর জেনারেল গিলেস্পি দেরাছুন হইতে কলুঙ্গা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে নেপাল রাজ্য চারি বিভিন্ন দিক হইতে একবারে আক্রান্ত হইল। নেপাল রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা সমুদয়ে দ্বাদশ সহস্র ; তাহার বিরুদ্ধে ইংরেজ গবর্নমেণ্ট ঊনত্রিংশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধের কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়— প্রয়োজনও নাই।

অগ্নিদগ্ধ না হইলে স্বর্ণের পরীক্ষা হয় না। মনুষ্যও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়। প্রলয়কালে পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা ও বন্ধন ঊর্ণনাভ-তন্তুর ন্যায় ছিন্ন হইয়া যায় ; বীরপুরুষ তখনই মুক্ত হইয়া আপনার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করেন।

যুদ্ধ ঘোষণার সময় নেপাল সীমান্তপ্রদেশে কলুঙ্গা নামক স্থানে অল্পসংখ্যক একদল গোরক্ষ-সৈন্য ছিল। সৈন্যসংখ্যা তিনশত মাত্র। বলভদ্র থাপা তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন। এস্থানে বহুদিনের পুরাতন একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ ছিল। অস্ত্র

শস্ত্রের বিশেষ অভাব। কাহারও তীর, ধনু ও খুড়কি, কাহারও বা পুরাতন বন্দুক— ইহাই যুদ্ধের উপকরণ। এতকাল যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা ছিল না, এইজন্য সৈনিকেরা তাহাদের পুত্র-কলত্র লইয়া এই স্থানে বাস করিতেছিল। স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যা প্রায় দেড়শত হইবে।

হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল যে, ইংরেজ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং কলুঙ্গা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। বলভদ্র এই সংবাদ পাইয়া পুরাতন ভগ্ন প্রাচীর কোনোপ্রকারে সংস্কার করিতে লাগিলেন। গোরক্ষ-সেনাপতি, স্ত্রীলোক ও শিশুগণ লইয়া বিব্রত এবং সৈন্য ও অস্ত্রাভাবে একান্ত বিপন্ন। এমন সময়ে ইংরেজ-সেনাপতি মাউব্রি পঁয়ত্রিশ শত সৈন্য ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া সত্বর এই স্থান অবরোধ করিলেন।

যে যুদ্ধে জয়ের আশা থাকে, সে যুদ্ধ অনেকেই করিতে পারে; কিন্তু যাহাতে পরাভব নিশ্চিত, সে যুদ্ধ যুঝিতে অমানুষিক বলের প্রয়োজন।

দেখিতে দেখিতে ইংরেজ-সৈন্য দুর্গের চারি দিক সেনাজালে আবদ্ধ করিল। বলভদ্র ভাবিতেছিলেন, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে সুদিনে কলুঙ্গার সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এখন দুর্দিন উপস্থিত। আজ নিমকের পরীক্ষা হইবে।

২৫শে অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ইংরেজ-দূত বলভদ্রের নিকট যুদ্ধপত্র লইয়া আসিল। সমস্ত দিনের

পরিশ্রমের পর বলভদ্র শয়ন করিতে গিয়াছেন, এমন সময় ইংরাজ সেনাপতির পত্র আসিল। পত্রে লিখিত ছিল, 'এই অসম যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করা বীরপুরুষের গ্লানিজনক নহে; গোরক্ষ-সেনাপতির বিনা রক্তপাতে দুর্গাধিকার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।' উত্তরে গোরক্ষ-সেনাপতি ইংরেজ-দূতকে বলিলেন, 'তোমাদের সুবাদারকে বলিও, আগামীকল্য যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ইহার উত্তর পাইবেন।'

পরদিন প্রত্যুষে কামানের গোলা এই ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তর লইয়া আসিল। চতুর্দিকে কামানের অগ্নির ধূম অপসারিত হইবার পূর্বেই ইংরেজ-সেনাপতি সমস্ত সেনা লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রস্তরস্তূপের পশ্চাতে এক অদম্য শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহা কামানের গোলা ভেদ করিতে পারে না। সেই মানসিক মহাশক্তি আজ চকিতে দেখা দিল এবং সুবাদার হইতে সামান্য সেনার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কেবল যোদ্ধার হৃদয়ে নহে— দুর্বল নারী ও নিরুপায় শিশুকেও সেই মহা অগ্নিশিখা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল।

ইংরেজ-সৈন্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে অক্ষম হইল। পরিশেষে জয়ের আশা নাই দেখিয়া দেরাদুনে প্রত্যাবর্তন করিল।

তাহার পর জেনারেল গিলেস্পি দুর্গ ভগ্ন করিবার উপযোগী নূতন কামান এবং নূতন সৈন্যদল লইয়া মাউব্রির সহিত যোগ

দিলেন। স্থির হইল, সৈন্যদল এক সময়ে চারি দিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিবে এবং কামানের গোলাতে দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিয়া অবারিত দ্বারে দুর্গে প্রবেশ করিবে।

২৬শে তারিখের নয় ঘটিকার সময় এই বিরাট আক্রমণ আরব্ধ হইল; কিন্তু অল্প সময়েই ইংরেজ-সৈন্য পরাহত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। তখন জেনারেল গিলেস্পি স্বয়ং নূতন তিন দল সৈন্য লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। একবারে বহু-সংখ্যক কামান অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া দুর্গে অনলপূর্ণ গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

দুর্গের নামমাত্র যে প্রাচীর ছিল, এই ঝটিকায় তাহা আর রক্ষা পাইল না, গোলার আঘাতে প্রস্তরস্তূপ খসিয়া পড়িতে লাগিল। আক্রান্ত গোরক্ষ-সৈন্যের ভাগ্যলক্ষ্মী এখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই সময়ে সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষিত হইল; ভগ্নস্থানে মুহূর্তমধ্যে এক প্রাচীর উত্থিত হইল। এই নূতন প্রাচীর সুকোমল নারীদেহে রচিত। গোরক্ষ-রমণীগণ স্বীয় দেহ দ্বারা প্রাচীরের ভগ্নস্থান পূর্ণ করিলেন। ইহার অনুরূপ দৃশ্য পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যায় নাই। কার্থেজের রমণীরা স্বীয় কেশপাশ ছিন্ন করিয়া ধনুর জ্যা রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু রক্তমাংসে গঠিত জীবন্ত শরীর দিয়া কুত্রাপি দুর্গপ্রাচীর নির্মিত হয় নাই। কেবল প্রাচীর নহে— এই দুর্বল কষ্ট-অসহিষ্ণু দেহ বজ্রবৎ কঠিন ও রণে ভীষণ সংহারক অস্ত্র হইয়া উঠিল।

এই সময়ে জেনারেল গিলেস্পি দুর্গপ্রাচীর অতিক্রম করিতে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু অধিক দূর না যাইতেই বক্ষে গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুগামী সৈন্য তীর ও গুলির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল ; ইংরেজ-সৈন্যের ভগ্নাবশেষ দেরাদুন প্রত্যাবর্তন করিল।

ইহার পর দিল্লি হইতে নূতন সৈন্যদল ও বহুসংখ্যক কামান যুদ্ধস্থানে প্রেরিত হইল। ২৪শে নবেম্বর তারিখে এই নূতন সৈন্যদল পুনরায় কলুঙ্গা আক্রমণ করিল।

এবার কামান হইতে গোলাপূর্ণ শেল অনবরত দুর্গে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ভূমিস্পর্শমাত্র এই শেল ভীষণ রবে শতধা বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দিকে মৃত্যুর করাল ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। এতদিন যোদ্ধায় যোদ্ধায় প্রতিযোগিতা চলিতেছিল ; কিন্তু এখন মৃত্যু সর্বগ্রাসীরূপে সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল—মাতার বক্ষে থাকিয়াও শিশু উদ্ধার পাইল না।

একমাসের অধিককাল কলুঙ্গার অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে। আহার্য সামগ্রী ফুরাইয়া গিয়াছে, যুদ্ধের উপকরণও নিঃশেষিত-প্রায়। এত বিপদের মধ্যেও যোদ্ধারা অবিচলিতচিত্ত। মুমূর্ষু শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য সাগরোর্মির ন্যায় ইংরেজ-সৈন্য দুর্গোপরি বারংবার পতিত হইতে লাগিল ; কিন্তু গোরক্ষ-সৈন্য অমানুষিক শক্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বারুদ ফুরাইলে তীর-ধনু দ্বারা, তাহা ফুরাইলে প্রস্তরনিক্ষেপে শত্রু

বিনাশ করিতে লাগিল। এই অসম সংগ্রামে গোরক্ষদেরই জয় হইল। দুর্গাধিকারের কোনো আশা নাই দেখিয়া ইংরেজ-সৈন্য দেরাদুনে প্রত্যাগমন করিতে আদিষ্ট হইল।

এমন সময়ে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কলুঙ্গার দুর্গে পানীয় জল নাই। দুর্গের বাহিরে এক নির্ঝরিণী হইতে গোরক্ষেরা রাত্রির অন্ধকারে জল লইয়া যায়। এই জল বন্ধ করিতে পারিলেই তৃষ্ণাতুর শত্রু নিরুপায় হইয়া পরাভূত হইবে।

নির্ঝরিণীর জল বন্ধ করা হইল। ইহার পর দুর্গমধ্যে যে ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল তাহা কল্পনারও অতীত— আহত ও মুমূর্ষু নরনারী এবং শিশুর 'জল জল' এই আর্তনাদ কেবল মৃত্যুর আগমনেই নীরব হইল।

এ দিকে ইংরেজেরা শত্রুকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া সিংহ-শিশুদিগকে জীবন্ত শৃঙ্খলবদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। দুর্গের চতুর্দিকে সৈন্যপাশ দৃঢ়ীকৃত হইল। অবরুদ্ধ দুর্গের বহির্গমন-পথে বহুসংখ্যক সৈন্য সন্নিবেশিত হইল। তাহারা দিবারাত্রি পথ অবরোধ করিয়া রহিল।

গোরক্ষ-সৈন্যের সংখ্যা প্রথমে তিনশত ছিল, মাসাধিক কাল যুদ্ধের পর সত্তর জন মাত্র রহিল। চারি দিন পর্যন্ত ইহাদের কেহ একবিন্দু জল স্পর্শ করে নাই, অনশন ও তৃষ্ণা নীরবে সহ্য করিয়াছে— তাহারা এ সকল কষ্ট অকাতরে

সহ্য করিতেছিল, কিন্তু নারী ও শিশুর আর্তনাদ ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। শত্রুর হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেই এই দারুণ কষ্ট শেষ হয়। কিন্তু হস্তের তরবারি শত্রুর পদে স্থাপন, প্রাণ থাকিতে হইবে না। জীবন থাকিতে কোনো উপায় নাই— জীবন দিয়াই বা কি উপায় আছে? সম্মুখে চারি দিক বেষ্টন করিয়া লোহিত রেখার জাল ক্রমে সংকীর্ণ হইতেছে। সেই রেখার মধ্যে মধ্যে অসিত বর্ণ কামানের বিকট মূর্তি দেখা যাইতেছে। এই জালে কি আবদ্ধ হইতে হইবে? অথবা জীবনবিন্দু এই রক্তিমা ক্ষণিকের জন্য গাঢ়তর করিবে? তবে তাহাই হউক!

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ দুর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। যে দ্বার সঙ্গীন ও কামানের গোলার আঘাতে উদ্ঘাটিত হয় নাই, আজ তাহা স্বতঃই উন্মুক্ত হইল। আত্মবলিদানে উন্মুক্ত সেই সত্তরটি বীর— মুষ্টিপ্রমাণ কৃষ্ণ মেঘের ন্যায়— অগণিত শত্রুদলের উপর পতিত হইল এবং অসির আঘাতে পথ কাটিয়া মুহূর্তে অদৃশ্য হইল।

পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজ-সৈন্য যোদ্ধ-পরিত্যক্ত দুর্গে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের উল্লাস বিষাদে পরিণত হইল। এই কি দুর্গ— না শ্মশান? এই শব-কবন্ধমণ্ডিত ভূমিতে কি প্রকারে মানুষ এতদিন বাস করিয়াছে? আহত, জীবিত ও মৃতের কি ভয়ানক সমাবেশ! এই যে সম্মুখে

সুবাদারের মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে, ইহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত চারি বৎসরের একটি শিশু কাঁদিতেছে। তাহার একটু অগ্রে একটি স্ত্রীলোক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার দুই উরু ভেদ করিয়া কামানের গোলা চলিয়া গিয়াছে। অদূরে বহু ছিন্ন হস্তপদ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে— এস্থানে শেল পড়িয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল। নিকটে কয়েকটি শিশু রক্তাপ্লুত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে— এখনও তাহাদের প্রাণবায়ু বাহির হয় নাই। চতুর্দিকে কেবল 'জল জল' এই কাতর ধ্বনি!

বলভদ্র সত্তরটি সঙ্গী লইয়া যেঁতগড়ের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইংরেজ-সৈন্য এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল ; কিন্তু অধিকার করিতে পারে নাই। তার পর বলভদ্র সৈন্যের আধিপত্য গ্রহণ করেন এবং নেপাল-যুদ্ধ শেষ হইলে স্বদেশে তাঁহার তরবারির আর আবশ্যক নাই দেখিয়া সঙ্গীদের সহিত রণজিৎ সিংহের শিখ-সৈন্যে প্রবেশ করেন।

এই সময়ে রণজিৎ সিংহ আফগান-যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। একবার তাঁহার একদল সৈন্য বহুসংখ্যক আফগান কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অনেকে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল, কেবল সত্তরটি সেনা রণভূমি ত্যাগ করিল না। এই কয়টি সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত্রুর দিকে মুখ করিয়া অটল পর্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইহারা অনেক বিপদের সময় পাশা-পাশি দাঁড়াইয়াছে, আজ এই শেষবার সুবাদার ও সিপাহী এক

শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইল। দূর হইতে কামান গর্জন করিতেছিল। এক এক বার সেই জীমূত-নাদ পর্বত ও উপত্যকা প্রতিধ্বনিত করিতেছিল— সেই সঙ্গে শ্রেণীর মধ্যে এক একটি স্থান শূন্য হইতে লাগিল ; কিন্তু শ্রেণী টলিল না। পরিশেষে পাশাপাশি সত্তরটি শবদেহ অনন্তশয্যায় শায়িত হইল। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড ধরায় পতিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিল।

ইংরেজ-সৈন্য কলুঙ্গা অধিকার করিয়া দুর্গ সমভূমি করিল। এখন পূর্বদুর্গস্থানে বন্ধুর প্রস্তরস্তূপ দৃষ্ট হয়। সেই দারুণ যুদ্ধের লীলাভূমিতে এখন গভীর নির্জনতা বিরাজিত। মৃত্যুর এ পারেই ঝটিকা, পরপারে চিরশান্তি। মরণের পরপার হইতেই বোধ হয় কোনো শান্তিময় আত্মা এই রণস্থলে আবির্ভূত হইয়া জেতৃগণের বীরহৃদয়ে করুণ রস সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন।

যে স্থানে জেতা ও বিজিতের দেহধূলি একত্র মিশ্রিত হইতেছিল সেই স্থানে ইংরেজ দুইটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিল। ইহা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। একটি প্রস্তরফলক জেনারেল গিলেস্পি ও কলুঙ্গা-যুদ্ধে হত ইংরেজ-সৈন্যের স্মরণার্থে স্থাপিত ; ইহার অদূরে দ্বিতীয় প্রস্তরফলকে লিখিত আছে :

আমাদের বীরশত্রু কলুঙ্গা-দুর্গাধিপতি বলভদ্র
এবং তাঁহার অধীনস্থ বীর সেনা
যাঁহারা রণে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন

অব্যক্ত

এবং

আফগান কামানের সম্মুখীন হইয়া

একে একে অকাতরে প্রাণদান করিয়াছিলেন—

সেই বীরগণের স্মরণার্থে

এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইল।

আমাদের বাড়ির নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কূল প্লাবন করিয়া জলস্রোত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইত ; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার ভাঁটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতিপরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোটো ছোটো তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলুকুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখনও মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে ইহা তো কখনও ফিরে না ; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে ? ইহার কি শেষ নাই ? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?' নদী উত্তর করিত 'মহাদেবের জটা হইতে।' তখন ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।

তাহার পর বড়ো হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি ; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি তখনই

সেই চিরাভ্যস্ত কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্ব কথা শুনিতাম 'মহাদেবের জটা হইতে।'

একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্ম পরিচিত, বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল? যে যায়, সে তো আর ফিরে না; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি! যে যায়, সে কোথা যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলে।"

চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ, নদী?" নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।"

একদিন আমি বলিলাম, "নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি! বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া

আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তি-স্থান দেখিয়া আসিব।”

শুনিয়াছিলাম, উত্তর পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায় তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া বহু গ্রাম, জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্মাচল নামক পুরাণপ্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূ নদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর পুনরায় বহুল গিরিগহন লঙ্ঘনপূর্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী ; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহদ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, “এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজতসূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে উহাই বহুদেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী, কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।”

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সম্মুখে দেখো, জয় নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল!"

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষারমূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়— মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহুজীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণপূর্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।[১]

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আয়ুধ সাকাররূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী তাহা পরে বুঝিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, "সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ

---

১ কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষার শিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

রহিয়াছে। উহা অতীব দুর্গম; দুই দিন চলিলে পর তুষার নদী দেখিতে পাইবে।”

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে ‘তিষ্ঠ’ বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী, বহুদূর প্রসারিত সেই পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখরতুষারনিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষার-নদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত ঊর্ধ্বে উঠিতেছি বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতন-প্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম— সমগ্র পর্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলু-মুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি, কি পতনশীল তুষার-পর্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত

ধূম্ররাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা ? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্রপ্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয় -রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্বতশ্রেণী দেখিতেছি, হিমাণুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে! প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্রনিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষার-শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষার-শয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করি।"

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে অনায়াসে সেই পর্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোনো পথ

ছিল না; পতিত পর্বতখণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল—উপত্যকা রচিত হইল। পর্বতগাত্রে ঘর্ষিত হইতে হইতে উপলস্তূপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি তাহার উভয়তঃ তুষার-বাহিত প্রস্তরখণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিবর্ত্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে একস্থানে উভয় কূলস্থ দেশ মরুভূমি-প্রায় হইয়াছিল। নদী তট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্বতের অস্থিচূর্ণ সংযোগে মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বর্ধিত হইল। কঠিন পর্বতের দেহাবশেষ দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যামদেহ নির্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে।

সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভগ্ন করিতেছে।

জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি স্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গাররূপে প্রকাশ

পাইতেছে। সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে ; ঊর্ধ্ব ভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নত হইয়া নূতন মহাদেশ নির্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝা -বলে পর্বত-শিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া তথায় বিপুল জটাজালের মধ্যে আশ্রয় লইবে ; আবার কাল-ক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই!

এখনও ভাগীরথী-তীরে বসিয়া তাঁহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না।

'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—

'মহাদেবের জটা হইতে।'

জড় জগতে কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বহুবিধ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহগণ সূর্যের আকর্ষণ এড়াইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুকেও একদিন সূর্যের দিকে ছুটিতে হয়।

জড় জগৎ ছাড়িয়া জঙ্গম জগতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের গতিবিধি বড়ো অনিয়মিত বলিয়া মনে হয়। মাধ্যাকর্ষণশক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্বদা সন্তাড়িত করিতেছে। প্রতি মুহূর্তে তাহারা আহত হইতেছে এবং সেই আঘাতের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রত্যুত্তরে তাহারা হাসিতেছে কিংবা কাঁদিতেছে। মৃদু স্পর্শ ও মৃদু আঘাত; ইহার প্রত্যুত্তরে শারীরিক রোমাঞ্চ, উৎফুল্লভাব ও নিকটে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্য রকমে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। হাত বুলাইবার পরিবর্তে যেখানে লগুড়াঘাত, সেখানে রোমাঞ্চ ও উৎফুল্লতার পরিবর্তে সন্ত্রাস ও পূর্ণমাত্রায় সংকোচ। আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ, সুখের পরিবর্তে দুঃখ, হাসির পরিবর্তে কান্না।

জীবের গতিবিধি কেবলমাত্র বাহিরের আঘাতের দ্বারা পরিমিত হয় না। ভিতর হইতে নানাবিধ আবেগ আসিয়া বাহিরের গতিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভিতরের আবেগ কতকটা অভ্যাস, কতকটা স্বেচ্ছাকৃত। এইরূপ বহুবিধ ভিতর ও বাহিরের আঘাত-আবেগের দ্বারা চালিত মানুষের গতি

কে নিরূপণ করিতে পারে? কিন্তু মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেহ এড়াইতে পারে না। সেই অদৃশ্য শক্তিবলে বহু বৎসর পরে আজ আমি আমার জন্মস্থানে উপনীত হইয়াছি।

জন্মলাভ সূত্রে জন্মস্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই যে সভার সভাপতির আসনে আমি স্থান লইয়াছি তাহার যুক্তি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞানসেবকের স্থান আছে? এই সাহিত্য-সম্মিলন বাঙালীর মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাংলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্বত্র গভীরভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই সম্মিলনের মধ্যে বাঙালীর যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নাই। এখানে সাহিত্যকে কোনো ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই, বরং মনে হয়, আমরা উহাকে বড়ো করিয়া উপলব্ধি করিবার সংকল্প করিয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোনো সুন্দর অলংকার মাত্র নহে—আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।

এই সাহিত্য-সম্মিলন-যজ্ঞে যাঁহাদিগকে পুরোহিতপদে বরণ করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিককেও দেখিয়াছি।

আমি যাঁহাকে সুহৃদ ও সহযোগী বলিয়া স্নেহ করি এবং স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের দেশমান্য আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র একদিন এই সম্মিলন-সভার প্রধান আসন অলংকৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া সাহিত্য-সম্মিলন যে কেবল গুণের পূজা করিয়াছেন তাহা নহে, সাহিত্যের একটি উদার মূর্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

অপর দিকে, বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেই দিকে সর্বদা লক্ষ রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই এককে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোনো প্রবল বাধা ঘটে না।

আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের

ব্যাপারে স্বভাবতঃই এই ঐক্যবোধ কাজ করিয়াছে। আমরা এই সম্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সংকীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরন্তু, আমরা তাহার অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছি।

ফলতঃ, জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে-কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাঁহাদের সকলকেই এই সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।

এই কারণে, যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল আমি বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি সাহিত্য-সম্মিলন-সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি, তাহাকে দেশের অন্যান্য নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পারে? আর এই সুযোগে আজ আমাদের দেশের সমস্ত সত্য-সাধকদের সহিত এক সভায় মিলিত হইবার

অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার আর কি হইতে পারে ?

কবিতা ও বিজ্ঞান

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ

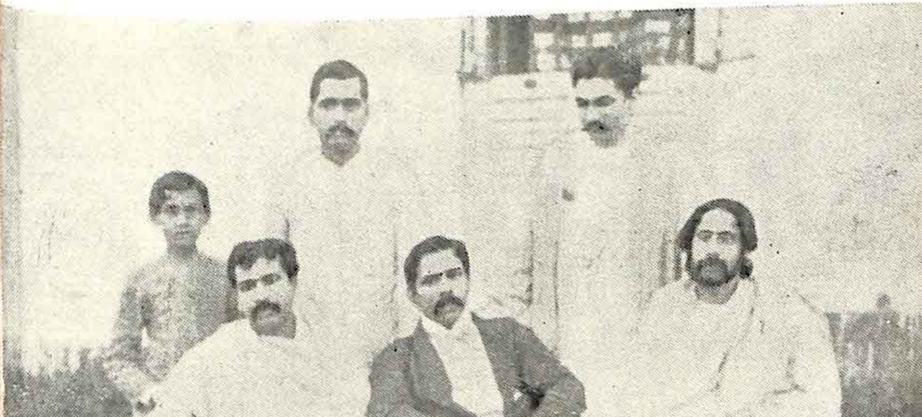
ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক-এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন ; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদ্‌কে সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্‌-না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতি দিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারে না! এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোনোমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে, তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশি দাবি করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান এবং ভাবি পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখনও কোনো অংশে দুর্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসংবরণ করিতে বিস্মৃত হন এবং বলিয়া উঠেন '"যেন" নহে— এই সেই'।



বৈজ্ঞানিক ও কবি

উপবিষ্ট । জগদীশচন্দ্র বসু, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দণ্ডায়মান । রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহিমচন্দ্র দেববর্মণ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অদৃশ্য আলোক

কবিতা ও বিজ্ঞানের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার উদাহরণস্বরূপ আপনাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীম রহস্যপূর্ণ জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহা কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্ট -ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, কেবলমাত্র তাহার সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলিব। কবির চক্ষু এই বহু রঙে রঞ্জিত আলোক-সমুদ্র দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটি রঙ তাহার চক্ষুর তৃষা মিটাইতে পারে নাই। তবে কি এই দৃশ্য-আলোকের সীমা পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?

এইরূপ অচিন্তনীয় অদৃশ্য আলোকের রহস্য যে আছে তাহার পথ জার্মানির অধ্যাপক হার্টজ প্রথম দেখাইয়া দেন। তড়িৎ-উর্মিসঞ্জাত সেই অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, কিরূপে অস্বচ্ছ বস্তুর আভ্যন্তরিক আণবিক সন্নিবেশ এই অদৃশ্য আলোকের দ্বারা ধরা যাইতে পারে। আপনারা আরও দেখিতেন, বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ভুল। যাহা অস্বচ্ছ মনে করি তাহার ভিতর দিয়া আলো অবাধে যাইতেছে। আবার এমন অদ্ভুত বস্তুও আছে যাহা এক দিক ধরিয়া দেখিলে স্বচ্ছ, অন্য দিক ধরিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ। আরও দেখিতে

পাইতেন যে, দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুমূল্য কাচ-বর্তুল দ্বারা দূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে সেইরূপ মৃৎ-বর্তুল সাহায্যে অদৃশ্য আলোকপুঞ্জও বহু দূরে প্রেরিত হয়। ফলতঃ দৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষাও অধিক।

আকাশ-সংগীতের অসংখ্য স্বরসপ্তকের মধ্যে একটি সপ্তক-মাত্র আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডিটিই আমাদের দৃশ্য-রাজ্য। অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা! কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই; সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

বৃক্ষজীবনের ইতিহাস

দৃশ্য আলোকের বাহিরে অদৃশ্য আলোক আছে; তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়। সেইজন্য রুদ্রজ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল

উদ্ভিদ-রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিব।

প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদ-জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোনো সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেণ্ডারসন বলেন যে, কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ বাহিরের আঘাতে দৃশ্যভাবে কিংবা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর প্রমুখ উদ্ভিদ-শাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষ স্নায়ুহীন। আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোনো সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয়, পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদ-জীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। উদ্ভিদ-জীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ— সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোনো কল এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানতঃ এ জন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ

ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোনো অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোনো কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয় তবে এইসব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়— সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয়, কোনো প্রকারে তাহা ধরিতে ও মাপিতে পারা।

জীব যখন কোনো বাহিরের শক্তি-দ্বারা আহত হয় তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে— যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিংবা 'নাড়া'র উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোনো প্ররোচনায় কাগজ-কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম। সেই আপাততঃ অসম্ভব কার্যে কোনো উপায়ে যদি সফল হইতে পারি তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার করা যে একান্ত শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এক লিপি-সভার সভ্যগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন, কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মতো— অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য।

সে যাহা হউক, মানস-সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক— প্রথমতঃ, গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করানো, দ্বিতীয়তঃ, গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে দিয়া আজ্ঞাপালন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষে আজ আমি সহৃদয় সভ্য-সমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি, নিরীহ গাছপালার নিকট

হইতে বলপূর্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি। এই জন্য বিচিত্র প্রকারের চিম্‌টি উদ্ভাবন করিয়াছি— সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং অ্যাসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সে সব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে, এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায় তাহার কোনো মূল্য নাই। ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।

যদি গাছ লেখনী-যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইতে পারিত। কিন্তু এই কথা তো দিবা-স্বপ্ন মাত্র। এইরূপ কল্পনা আমাদের জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র। ভাবুকতার তৃপ্তি সহজসাধ্য ; কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ইহা ক্রমে ক্রমে মর্মগ্রন্থি শিথিল করে।

যখন স্বপ্নরাজ্য হইতে উঠিয়া কল্পনাকে কর্মে পরিণত করিতে চাই তখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পাই। প্রকৃতিদেবীর মন্দির লৌহ-অর্গলিত। সেই দ্বার ভেদ করিয়া শিশুর আবদার এবং ক্রন্দনধ্বনি ভিতরে পৌঁছে না ; কিন্তু যখন বহু কালের একাগ্রতা-সঞ্চিত শক্তিবলে রুদ্ধ দ্বার ভাঙিয়া যায় তখনই প্রকৃতিদেবী সাধকের নিকট আবির্ভূত হন।

ভারতে অনুসন্ধানের বাধা

সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণবিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। এ কথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে, যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সে স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ করো। মনে করো, আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন সে-ই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষাসাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোনো কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের

মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না ; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।

গাছের লেখা

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলাম। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনা মাত্র ছিল তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কল-গুলির গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে ; বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে মুহূর্তে নির্ণীত হইবে, তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও

মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে, এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে-কলের নির্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এ দেশে আমাদের কারিকর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এই দেশীয়।

এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বৃক্ষজীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে কোনো প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম বৃক্ষ-জীবন যেন মানবজীবনেরই ছায়া। কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছিলাম। স্বীকার করিতে হয়, সেটা যৌবনসুলভ অতি সাহস এবং কথার উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং স্বপ্ন ও জাগরণ আজ একত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

উপসংহার

আমি সম্মিলন-সভায় কি দেখিলাম, উপসংহার কালে আপনাদিগের নিকট সেই কথা বলিব।

বহুদিন পূর্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে

গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অর্ধ অন্ধকারে বিশ্বকর্মার মূর্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুকর তাহাদের আপন আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র দেবমূর্তির পদতলে রাখিয়া পূজা করিতেছে।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এই বাহুই বিশ্বকর্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডকে নানাপ্রকারে বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। সেই মহাশিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আবির্ভাবের ফলেই আমরা মন ও হস্তের দ্বারা সেই শিল্পীর নানা অভিপ্রায়কে নানা রূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি; কখনও শিল্পকলায়, কখনও সাহিত্যে, কখনও বিজ্ঞানে।

গুহামন্দিরে যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম, আমাদের দেশের বিশ্বকর্মা বাঙালী-চিত্তের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন তাঁহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবিকল্পনা, কোথাও যুক্তিবিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।

মানবশক্তির মধ্যে এই দৈবশক্তির আবির্ভাব, ইহা আমাদের

দেশের চিরকালের সংস্কার। দৈবশক্তির বলেই জগতে সৃজন ও সংহার হইতেছে। মানুষে দৈবশক্তির আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষ সৃজন করিতেও পারে এবং সংহার করিতেও পারে। আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।

সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাংলা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষদকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না ; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোনো বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে।

আন্তরদৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্যপরিষদ সাধকদের সম্মুখে দেব-মন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাংলা দেশের মর্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহার-স্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।

ঘর হইতে বাহির হইলেই চারি দিক ব্যাপিয়া জীবনের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। সেই জীবন একেবারে নিঃশব্দ। শীত ও গ্রীষ্ম, মলয় সমীর ও ঝটিকা, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, আলো ও আঁধার এই নির্বাক্ জীবন লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, কত প্রকারের আঘাত ও কত প্রকারের আভ্যন্তরিক সাড়া এই স্থির, এই নিশ্চলবৎ জীবন-প্রতিমার ভিতরে কত অদৃশ্য ক্রিয়া চলিতেছে! কি প্রকারে এই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করিব?

গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকটই যাইতে হইবে। সেই ইতিহাস অতি জটিল এবং বহু রহস্যপূর্ণ। সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে বৃক্ষ ও যন্ত্রের সাহায্যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার ক্রিয়া-কলাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। ইহাতে মানুষের কোনো হাত থাকিবে না; কারণ মানুষ তাহার স্বপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।

এই যে তিল তিল করিয়া বৃক্ষশিশুটি বাড়িতেছে, যে বৃদ্ধি চক্ষে দেখা যায় না, মুহূর্তের মধ্যে কি প্রকারে তাহাকে পরিমাণের মধ্যে ধরিয়া দেখাইতে পারিব? সেই বৃদ্ধি বাহিরের আঘাতে কি নিয়মে পরিবর্তিত হয়? আহার দিলে কিংবা

আহার বন্ধ করিলে কি পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তন আরম্ভ হইতে কত সময় লাগে? ঔষধ সেবনে কিংবা বিষ প্রয়োগে কি পরিবর্তন উপস্থিত হয়? এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের প্রতিকার করা যাইতে পারে কি? বিষের মাত্রা প্রয়োগে কি ফলের বৈপরীত্য ঘটে?

তাহার পর গাছ বাহিরের আঘাতে যদি কোনোরূপ সাড়া দেয় তবে সেই আঘাত অনুভব করিতে কত সময় লাগে? সেই অনুভব-কাল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কি পরিবর্তিত হয়? সে সময়টা কি গাছকে দিয়া লিখাইয়া লইতে পারা যায়? বাহিরের আঘাত ভিতরে কি করিয়া পৌঁছে? স্নায়ুসূত্র আছে কি? যদি থাকে তবে স্নায়ুর উত্তেজনাপ্রবাহ কিরূপ বেগে ধাবিত হয়? কোন্ অনুকূল ঘটনায় সেই প্রবাহের গতি বৃদ্ধি হয়? কোন্ প্রতিকূল অবস্থায় নিবারিত অথবা নিরস্ত হয়? আমাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার সহিত বৃক্ষের ক্রিয়ার কি সাদৃশ্য আছে? সেই গতি ও সেই গতির পরিবর্তন কোনো প্রকারে কি স্বতঃলিখিত হইতে পারে? জীবে হৃৎপিণ্ডের ন্যায় যেরূপ স্পন্দনশীল পেশী আছে, উদ্ভিদে কি তাহা আছে? স্বতঃস্পন্দনের অর্থ কি? পরিশেষে যখন মৃত্যুর প্রবল আঘাতে বৃক্ষের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়, সেই নির্বাণ-মুহূর্ত কি ধরিতে পারা যায় এবং সেই মুহূর্তে কি বৃক্ষ কোনো একটা প্রকাণ্ড সাড়া দিয়া চিরকালের জন্য নিদ্রিত হয়?

এই সব বিবিধ অধ্যায়ের ইতিহাস বিবিধ যন্ত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হইলেই গাছের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হইবে।

তরুলিপি

জীব কোনোরূপ আঘাত পাইলে চকিত হয়। সেই সংকোচনই জীবনের সাড়া। জীবনের পরিপূর্ণ অবস্থায় সাড়া বৃহৎ হয়, অবসাদের সময় ক্ষীণ হয় এবং মৃত্যুর পর সাড়ার অবসান হয়। বৃক্ষও আহত হইলে ক্ষণিকের জন্য সংকুচিত হয়; কিন্তু সেই সংকোচন স্বল্প বলিয়া সচরাচর দেখিতে পাই না। কলের সাহায্যে সেই স্বল্প আকুঞ্চন বৃহদাকারে লিপিবদ্ধ হইতে পারে। ইহার বাধা এই যে, বৃক্ষের আকুঞ্চনশক্তি অতি ক্ষীণ এবং সাড়া লিখিত হইবার সময় লেখনীফলকের ঘর্ষণে থামিয়া যায়। এই বাধা দূর করিবার জন্য 'সমতাল' যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যদি দুই বিভিন্ন বেহালার তার একই সুরে বাঁধা যায় তাহা হইলে একটি তার বাজাইলে অন্য তারটি সমতালে ঝংকার দিয়া থাকে। তরুলিপিযন্ত্রে লেখনী লৌহ-তারে নির্মিত এবং এই তারটি বাহিরের অন্য তারের সহিত এক সুরে বাঁধা। মনে কর, দুইটি তারই প্রতি সেকেণ্ডে একশত বার কম্পিত হয়। বাহিরের তার বাজাইলে লেখনীও একশত বার স্পন্দিত হইবে এবং ফলকে একশত বিন্দু অঙ্কিত করিবে।

এইরূপে ফলকের সহিত ক্রমাগত ঘর্ষণের বাধা দূরীভূত হয়। ইহা ব্যতীত সাড়ালিপিতে সময়ের সূক্ষ্মাংশ পর্যন্ত নিরূপিত হয়; কারণ এক বিন্দু ও পরবর্তী বিন্দুর মধ্যে এক সেকেণ্ডের শতাংশের ব্যবধান।

গাছ লাজুক কি অ-লাজুক

পরীক্ষার ফল বর্ণনা করিবার পূর্বে তরুজাতিকে যে লাজুক ও অ-লাজুক, সসাড় ও অসাড় বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে সেই কুসংস্কার দূর করা আবশ্যক। সব গাছই যে সাড়া দেয় তাহা বৈদ্যুতিক উপায়ে দেখানো যাইতে পারে। তবে কেবল লজ্জাবতী লতাই কেন পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়, সাধারণ গাছ কেন দেয় না? ইহা বুঝিতে হইলে ভাবিয়া দেখুন যে, আমাদের বাহুর এক পাশের মাংসপেশীর সংকোচন দ্বারাই হাত নাড়িয়া সাড়া দেই। উভয় দিকের মাংসপেশীই যদি সংকুচিত হইত তবে হাত নড়িত না। সাধারণ বৃক্ষের চতুর্দিকের পেশী আহত হইয়া সমভাবে সংকুচিত হয়; তাহার ফলে কোনো দিকেই নড়া হয় না। কিন্তু এক দিকের পেশী যদি ক্লোরোফর্ম দিয়া অসাড় করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সাধারণ গাছের সাড়া দিবার শক্তিও সহজেই প্রমাণিত হয়।

অনন্থভূতি কাল নিরূপণ

জীব যখন আহত হয় ঠিক সেই মুহূর্তে সাড়া দেয় না। ভেকের পায়ে চিমটি কাটিলে সাড়া পাইতে তার ন্যূনাধিক সেকেণ্ডের শত ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। ইংরেজি ভাষ্যে এই সময়টুকু 'লেটেণ্ট পিরিয়ড্'। 'অনন্থভূতি-সময়' ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইল।

বাহিরের অবস্থা অনুসারে এই অনন্থভূতি-কালের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মৃত্ব আঘাত অন্থভব করিতে একটু সময় লাগে, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত অন্থভব করিতে বেশি সময়ের অপব্যয় হয় না। আর যখন শীতে জীব আড়ষ্ট থাকে তাহার অন্থভূতি-কাল তখন দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আমরা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি তখনও অন্থভূতি করিবার পূর্বকাল একান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে, এমন-কি সে সময়ে কখনও কখনও একেবারেই অন্থভবশক্তি লোপ পায়। গাছের অন্থভূতি সম্বন্ধে এই একই প্রথা। লজ্জাবতীর তাজা অবস্থায় অনন্থভূতি-কাল সেকেণ্ডের শতাংশের ছয় ভাগ— উত্তমশীল ভেকের তুলনায় কেবলমাত্র ছয় গুণ বেশি। আর একটি আশ্চর্য বিষয় এই যে, স্থূলকায় বৃক্ষ দিব্য ধীরে স্থস্থে সাড়া দিয়া থাকে। কিন্তু কৃশকায়টি একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বসে। মনুষ্যলোকেও ইহার সাদৃশ্য আছে কি না, আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শীতে গাছের অনন্থভূতি-কাল প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

আঘাতের পর গাছের প্রকৃতিস্থ হইতে প্রায় পনেরো মিনিট লাগে। তাহার পূর্বে আঘাত করিলে অননুভূতি-সময় প্রায় দেড় গুণ দীর্ঘ হয়। অধিক ক্লান্ত হইলে অনুভূতিশক্তির সাময়িক লোপ হয়, তখন গাছ একেবারেই সাড়া দেয় না। এ অবস্থাটি যে কিরূপ অবস্থা, আমার দীর্ঘ বক্তৃতার পর তাহা আপনারা সহজেই হৃদয়ংগম করিতে পারিবেন।

সাড়ার মাত্রা

সময়ভেদে একই আঘাতে সাড়ার প্রবলতার তারতম্য ঘটে। সকাল বেলা রাত্রির নিশ্চেষ্টতা-জনিত গাছের একটু জড়তা থাকে। আঘাতের পর আঘাতে সে জড়তা চলিয়া যায় এবং সাড়ার মাত্রা ক্রমে বাড়িতে থাকে ; সেটা যেন জাগরণের অবস্থা। গরম জলে স্নান করাইয়া লইলে গাছের জড়তা শীঘ্রই দূর হয়। বিকাল বেলা এ সব উল্টা হইয়া যায় ; ক্লান্তিবশতঃ সাড়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু বিশ্রামের জন্য সময় দিলে সেই ক্লান্তি চলিয়া যায়। আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে সাড়ার মাত্রাও বাড়িতে থাকে ; কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। এ বিষয়ে মানুষের সহিত গাছের প্রভেদ নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শীতকালে ঘা খাইলে যেমন সারিতে আমাদের অনেকটা সময় লাগে, শীতকালে গাছেরও আঘাত খাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। গ্রীষ্মকালে

যাহা পনেরো মিনিটে সারিয়া যায় তাহা সারিতে শীতকালে আধ ঘণ্টার অধিক লাগে।

বৃক্ষে উত্তেজনাপ্রবাহ

জন্তুদেহে এক স্থানে আঘাত করিলে আঘাতের ধাক্কা স্নায়ু দ্বারা দূরে পৌঁছে। স্নায়বীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ, স্নায়বীয় বেগ বিবিধ অবস্থায় হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতায় বেগ বৃদ্ধি এবং শৈত্যে বেগ হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যুৎপ্রবাহে স্নায়ুতে কতকগুলি বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। যতক্ষণ স্নায়ু দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিতে থাকে ততক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটে না। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রেরণ এবং বন্ধ করিবার সময় কোনো বিশেষ স্থলে উত্তেজনা এবং অন্য স্থানে অবসাদ পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিবার মুহূর্তে যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ স্নায়ুসূত্র পরিত্যাগ করে সেই স্থলেই স্নায়ু হঠাৎ উত্তেজিত হয়। এতদ্ব্যতীত যদি স্নায়ুর কোনো অংশে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা যায় তবে সেই অংশ দিয়া আর কোনো সংবাদ যাইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিলে অমনি রুদ্ধ পথ খুলিয়া যায়, স্নায়ুসূত্র পুনরায় সংবাদবাহক হয়।

যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষদেহেও যে স্নায়বীয় সংবাদ প্রেরিত হয় তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে ধরা যাইতে পারে এবং একই কলের

সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ পৌঁছিতে কত সময় লাগে তাহাও নির্ণীত হয়। স্নায়বীয় বেগ বৃক্ষদেহে ভেকদেহের তুলনায় মন্থর; কিন্তু নিম্নজাতীয় জন্তু হইতে দ্রুত। প্রাণী ও উদ্ভিদে নয় ডিগ্রি উষ্ণতায় স্নায়ুবেগ প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহের আরম্ভকালে বৃক্ষস্নায়ুর এক স্থান উত্তেজিত, অন্য স্থল অবসাদিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ-দ্বারা বৃক্ষের স্নায়বীয় ধাক্কা হঠাৎ বন্ধ হয়। স্নায়ু সম্বন্ধে যত প্রকার পরীক্ষা আছে, সমস্ত পরীক্ষা-দ্বারা জীব ও উদ্ভিদে যে এ সম্বন্ধে কোনো ভেদ নাই তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

স্বতঃস্পন্দন

জীবদেহে অংশ বিশেষে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। মানুষ এবং অন্যান্য জীবে এরূপ পেশী আছে যাহা আপনা-আপনি স্পন্দিত হয়। যত কাল জীবন থাকে তত কাল হৃদয় অহরহ স্পান্দিত হইতেছে। কোনো ঘটনাই বিনা কারণে ঘটে না। কিন্তু জীবস্পন্দন কি করিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইল? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তবে উদ্ভিদেও এইরূপ স্বতঃস্পন্দন দেখা যায়। তাহার অনুসন্ধানফলে সম্ভবত জীবস্পন্দন-রহস্যের কারণ প্রকাশিত হইবে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া ভেক ও

কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খেলা করেন। হৃদয় জানা কথাটি শারীরিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি, কবিতার অর্থে নহে। সমস্ত ব্যাঙটিকে লইয়া পরীক্ষা সুবিধাজনক নহে; এজন্য তাঁহারা হৃদয়টিকে কাটিয়া বাহির করেন, পরীক্ষা করেন কি কি অবস্থায় হৃদয়-গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

হৃদয় কাটিয়া বাহির করিলে তাহার স্বাভাবিক স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন সূক্ষ্ম নল দ্বারা হৃদয়ে রক্তের চাপ দিলেই স্পন্দন ক্রিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অক্ষুণ্ণ গতিতে চলিতে থাকে। এ সময়ে উত্তাপিত করিলে হৃদয়স্পন্দন অতি দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয়; কিন্তু ঢেউগুলি খর্বকায় হয়। শৈত্যের ফল ইহার বিপরীত। নানাবিধ ভৈষজ্য দ্বারা হৃদয়ের স্বাভাবিক তাল বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়। ইথার প্রয়োগে ক্ষণিকের জন্য হৃদয়স্পন্দন স্থগিত হয়, হাওয়া করিলে সেই অচৈতন্য অবস্থা চলিয়া যায়। ক্লোরোফরমের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সাংঘাতিক। মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদয়ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিবিধ বিষপ্রয়োগে হৃদয়স্পন্দন বন্ধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য রহস্য এই যে, কোনো বিষে হৃদয়স্পন্দন সংকুচিত অবস্থায়, অন্য বিষে ফুল্ল অবস্থায় নিস্পন্দিত হয়। এইরূপ পরস্পরবিরোধী এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের ক্রিয়া ক্ষয় হইতে পারে।

জীবের স্বতঃস্পন্দন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কয়টি প্রধান ঘটনা

বর্ণনা করিলাম। গাছেও কি এই সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়? নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া কোনো কোনো উদ্ভিদ-পেশীও যে স্পন্দনশীল তাহার বহুবিধ প্রমাণ পাইয়াছি।

বনচাঁড়ালের নৃত্য

বনচাঁড়াল গাছ দিয়া উদ্ভিদের স্পন্দনশীলতা অনায়াসে দেখা যাইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র পাতাগুলি আপনা-আপনি নৃত্য করে। লোকের বিশ্বাস যে, হাতের তুড়ি দিলেই নৃত্য আরম্ভ হয়। গাছের সংগীতবোধ আছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু বনচাঁড়ালের নৃত্যের সহিত তুড়ির কোনো সম্বন্ধ নাই। তরুস্পন্দনের সাড়ালিপি পাঠ করিয়া জন্তু ও উদ্ভিদের স্পন্দন যে একই নিয়মে নিয়মিত তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেছি।

প্রথমতঃ, পরীক্ষার সুবিধার জন্য বনচাঁড়ালের পত্র ছেদন করিলে স্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নল দ্বারা উদ্ভি রসের চাপ দিলে স্পন্দন ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয় এবং অনিবারিত গতিতে চলিতে থাকে। তাহার পর দেখা যায় যে, উত্তাপে স্পন্দনসংখ্যা বর্ধিত, শৈত্যে স্পন্দনের মন্থরতা ঘটে। ইথার প্রয়োগে স্পন্দন ক্রিয়া স্তম্ভিত হয়; কিন্তু বাতাস করিলে অচৈতন্য ভাব দূর হয়। ক্লোরোফরমের প্রভাব মারাত্মক। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যে বিষ দ্বারা যে ভাবে

স্পন্দনশীল হৃদয় নিস্পন্দিত হয়, সেই বিষে সেই ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়। উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, স্বতঃস্পন্দনের মূল রহস্য কি। উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, কোনো কোনো উদ্ভিদ-পেশীতে আঘাত করিলে সেই মুহূর্তে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। তবে যে বাহিরের শক্তি উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিনষ্ট হইল তাহা নহে; উদ্ভিদ সেই আঘাতের শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এইরূপে আহারজনিত বল, বাহিরের আলোক, উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ সঞ্চয় করিয়া রাখে; যখন সম্পূর্ণ ভরপূর হয় তখন সঞ্চিত শক্তি বাহিরে উথলিয়া পড়ে। সেই উথলিয়া পড়াকে আমরা স্বতঃস্পন্দন মনে করি। যাহা স্বতঃ বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে তাহা সঞ্চিত বলের বহিরোচ্ছ্বাস। যখন সঞ্চয় ফুরাইয়া যায় তখন স্বতঃ-স্পন্দনেরও শেষ হয়। ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া বনচাঁড়ালের সঞ্চিত তেজ হরণ করিলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। খানিকক্ষণ পর বাহির হইতে উত্তাপ সঞ্চিত হইলে পুনরায় স্পন্দন আরম্ভ হয়।

গাছের স্বতঃস্পন্দনে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কতকগুলি গাছে অতি অল্প সঞ্চয় করিলেই শক্তি উথলিয়া উঠে; কিন্তু তাহাদের স্পন্দন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। স্পন্দিত অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তাহারা উত্তেজনার কাঙাল। বাহিরের উত্তেজনা

বন্ধ হইলেই অমনি স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। কামরাঙা গাছ এই জাতীয়।

আর কতকগুলি গাছ বাহিরের আঘাতেও অনেক কাল সাড়া দেয় না; দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা সঞ্চয় করিতে থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের পরিপূর্ণতা বাহিরে প্রকাশ পায় তখন তাহাদের উচ্ছ্বাস বহুকাল স্থায়ী হয়। বনচাঁড়াল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ।

মানুষের একটা অবস্থাকে স্বতঃ- উদ্ভাবনশীলতা অথবা উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থার জন্য সঞ্চয় এবং পরিপূর্ণতার আবশ্যক। কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, সেই অবস্থা স্বতঃস্পন্দনেরই একটি উদাহরণ বিশেষ। যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে সেই অবস্থা-অভিলাষী সাধক চিন্তা করিয়া দেখিবেন, কোন্ পথ— কামরাঙা অথবা বনচাঁড়ালের পদাঙ্ক অনুসরণ— তাঁহার পক্ষে শ্রেয়।

মৃত্যুর সাড়া

পরিশেষে উদ্ভিদের জীবনে এরূপ সময় আসে যখন কোনো এক প্রচণ্ড আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্তে গাছের স্থির স্নিগ্ধ মূর্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া কিংবা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের অবস্থা। মৃত্যুর

রুদ্র-আহ্বান যখন আসিয়া পৌঁছে তখন গাছ তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয় ? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায় তেমনি দেখিতে পাই, অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ মুহূর্তের জন্য মুমূর্ষু বৃক্ষগাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি পরিবর্তিত হয়— উর্ধ্বগামী রেখা নিম্নদিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষের অন্তিম সাড়া।

এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে তাহাদের গভীর মর্মের কথা তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করিল। জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইল। কল্পনারও অতীত অনেকগুলি সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বহুত্বের ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল।

বিশ্বমানবের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করিতে ভারতবর্ষ যাহা নিবেদন করিয়াছে, তাহার এক বিশিষ্টতা দেখা যায় এই যে, উহা সকল সময়ে ক্ষুদ্র ছাড়িয়া বৃহতের সন্ধান করিয়াছে। অন্য দেশে জ্ঞানরাজ্য এত বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হইয়াছে যে, তথায় সমগ্রকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রণালী অন্যরূপ। তাই তাহার কাব্য, তাহার সাহিত্য, জ্ঞানের অন্তর্নিহিত এই মহান্ সত্য ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জ্ঞানের অন্বেষণে আকাশে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা, বিশ্বের অগণিত জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের কোটি সূর্যের মধ্যে সেই একতার সন্ধান করিয়াছে। তাই বোধ হয়, আপনারা জ্ঞান ও সাহিত্যকে একে অন্যের অঙ্গ মনে করিয়া দুই বৎসর পূর্বে একজন বিজ্ঞানসেবীকে তাঁহার অজ্ঞাতে এই সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্বে নিযুক্ত করেন।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে তাহা অন্য দিন বলিব। তৎপূর্বে পরিষদের ভবিষ্যৎ উন্নতিকল্পে কয়েকটি কথা আজ উত্থাপন করিব। যখন আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে নিয়োগ করেন তখন এ সম্বন্ধে আমার আপত্তি জানাইয়াছিলাম। এক দিকে সময়াভাব ও ভগ্ন স্বাস্থ্য, অন্য দিকে পরিষদে কোনো কার্য করা সম্ভব হইবে কি না, এ সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল। শুনিয়াছিলাম, এখানে দলাদলি এত প্রবল এবং আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয়

যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। এ জন্য অস্বীকার করিয়া লিখি। তাহা সত্ত্বেও যখন আপনারা আমাকে মুক্তি দেন নাই তখন স্থির করিলাম, সাহিত্য-পরিষদের জন্য যথাসাধ্য কার্য করিব এবং ইহার পূর্ণশক্তি বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইব। যে মুমূর্ষু সে-ই মৃত বস্তু লইয়া আগলাইয়া থাকে ; যে জীবিত তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইয়াছি যে, বর্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ লইয়া থাকিবে না ; বর্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি জীবন্ত সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে। ইহাই আমি সাহিত্য-পরিষদের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য মনে করি। এই উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিবার পথে যে বাধা, যে অন্তরায় আছে তাহা দূর করিতে হইবে। তাহার পর দেশের চিন্তাশীল মনীষীদিগের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা যাহাতে একত্রীভূত করিতে পারা যায় তজ্জন্য যত্নবান হইতে হইবে।

আরও ভাবিবার বিষয় আছে। যে দলাদলি হইতে পরিষদের উন্নতি পঙ্গুপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, সেই দলাদলি হইতে পরিষদকে কিরূপে রক্ষা করা যায় এবং এই সব বাধা দূরীভূত করিয়া পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য— সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কিরূপে সাধিত হইতে পারে ?

দলাদলি

জীবনের বহু বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ও নানা দেশ পরিভ্রমণের ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা কোথা হইতে আসে এবং বিফলতা কেনই বা হয়। আমি দেখিয়াছি, যে অনুষ্ঠানে কর্তৃত্ব শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপর ন্যস্ত হয়, যেখানে অপর-সকলে নিজেদের দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দর্শকরূপে হয় শুধু করতালি দেন, নাহয় কেবল নিন্দাবাদ করেন, সেখানে কর্ম শুধু কর্তার ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য যে শক্তি সাধারণে তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিল, এমন এক দিন আসে, যখন সেই শক্তি সাধারণকে দলন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন দেশ বহু দূরে সরিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত শক্তি উদ্দামভাবে চলিতে থাকে। ইহাতে দলাদলির যে ভীষণ বহ্নি উদ্ভূত হয় তাহা অনুষ্ঠানটিকে পর্যন্ত গ্রাস করিতে আসে। দলপতি যদি তাঁহার সহকারীদিগকে কেবল যন্ত্রের অংশ মনে না করিয়া প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে জাগরূক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। এই কারণে সাহিত্যপরিষদে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের পরিবর্তে সাধারণের মিলিত চেষ্টা যাহাতে বলবতী হয় সেজন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিষ্ঠিত কোনো সাহিত্য-সমিতিকে খর্ব করিয়া নিজেরা বড়ো হইবার প্রয়াস আমি একান্ত হেয় মনে করি বলিয়া প্রত্যেক সমিতির আনুকূল্য ও শুভ ইচ্ছা আদান-প্রদানের জন্য

চেষ্টিত হইয়াছি। সাধারণ সদস্যদিগের উদ্যমের উপর পরিষদের ভাবী মঙ্গল যে বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, এ কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে লিখিয়াছিলাম— 'পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও কার্যনির্বাহক সভা সাহিত্যপরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ মাত্র!' আরও লিখিয়াছিলাম যে, 'সদস্যগণ যদি নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিঃস্বার্থ ও কর্তব্যশীল সভ্য নির্বাচিত করেন তাহা হইলেই পরিষদের উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের শৈথিল্যই ভবিষ্যৎ-দুর্গতির কারণ হইবে।' এই সহজ পথ অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অবলম্বিত উপায় কি শ্রেয় হইবে? তথায় প্রতিযোগিতারই পূর্ণ প্রকাশ। সহযোগিতা কি আমাদের সাধনা নয়? রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পক্ষ ও বিপক্ষের ভেদ প্রবল হইয়া উঠে। এক পক্ষ অন্য পক্ষের ছিদ্র অন্বেষণ করে ও কুৎসা রটায়, অন্য পক্ষও জবাবে এক কাঠি উপরে উঠেন। ইহার শেষ কোথায়? যে চিত্তবৃত্তির মহৎ উচ্ছ্বাসে সাহিত্য বিকশিত হয় তাহা কি এইরূপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইবে?

নবীন ও প্রবীণের মধ্যে একটা বৈষম্য আছে। তবে তাহাই বিসংবাদের প্রধান কারণ নহে। ব্যক্তিবিশেষের আত্মম্ভরিতাই প্রকৃত দলাদলির কারণ; ইহা প্রবীণ বা নবীন কাহারও নিজস্ব নহে। প্রবীণ অতি সাবধানে চলিতে চাহেন, কিন্তু পৃথিবীর গতি অতি দ্রুত। যদিও বার্ধক্য তাহার শরীরে

জড়তা আনয়ন করে, মন তো তাহার অনেক উপরে, সে তো চিরনবীন! মন কেন সাহস হারাইবে? অন্য দিকে নবীন, অভিজ্ঞতা অভাবে হয়তো অতি দ্রুত চলিতে চাহেন এবং বাধার কথা ভাবিয়া দেখেন না। যাঁহারা বহুকাল ধরিয়া কোনো অনুষ্ঠানকে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রয়াসের ইতিহাস ভুলিয়া যান। হয়তো কখনও প্রবীণের বহু কষ্টে অর্জিত ধন নবীন বিনা দ্বিধায় নিজস্ব করিতে চাহেন। প্রবীণ ইহাতে অকৃতজ্ঞতার ছায়া দেখিতে পান। সে যাহা হউক, ধরিত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চায়। প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এতদিনের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। যে দেশে আমাদের সামাজিক জীবনে নবীন ও প্রবীণের কার্যকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে, সে স্থানেও কি একথা আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে?

পরিষদের কার্য সাধারণ সদস্যগণের নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁহারাই সাধারণের প্রতিভূ হইয়া আসেন; তাঁহাদের অধিকাংশের মতের দ্বারাই প্রতি বিষয় নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কার্য সম্পাদনের অন্য উপায় নাই। যদি ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের মত গৃহীত না হয় এবং তজ্জন্য যদি কেহ পরিষদের সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চাহেন তবে উহাকে ছেলেদের আবদার ছাড়া কি

বলা যাইতে পারে? আর একটা কথা—অতীতের ত্রুটি সম্পূর্ণ মুছিয়া না ফেলিলে কোনো নূতন প্রচেষ্টা একেবারেই অসম্ভব।

যে সব ত্রুটির কথা বলিলাম তাহা একান্ত সাময়িক। বাদানুবাদের অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তাহার অনেকটা তিলকে তাল করিবার অভ্যাস হইতে। আমি উভয় পক্ষকেই, তাঁহাদের মধ্যে কি কি বিষয় লইয়া বিসংবাদ তাহা আমাকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; পরে তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। দেখা গেল, বিবাদের প্রকৃত কারণ কিছু নাই বলিলেই হয়।

পরিষদ-গৃহে বক্তৃতা

যে সব বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলাম তাহা কার্য করিবার উপলক্ষ মাত্র। সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদর্থে প্রতিভাশালী মনীষীদের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছি।

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন। সেই কমিশনের বিদেশীয় সভ্যগণ ইহার কার্য লক্ষ্য করিয়া ইহাকে জাতীয় জীবন পরিস্ফুটনের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্য

প্রদেশে ভ্রমণকালেও দেখিলাম, আমাদের এই সাহিত্যপরিষদকে আদর্শ করিয়া তথায় অন্য পরিষদ গঠনের চেষ্টা হইতেছে। এ সবই তো আশার কথা— আশা ব্যতীত আর কি আমাদের সম্বল আছে? সম্মুখে যে ভয়ংকর দুর্দিন আসিতেছে তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পর্যন্ত সংকটাপন্ন। দুর্দিনের মধ্যে কি আশা লইয়া তবে থাকিব? যে দুই একটি আশার কথা আছে, তাহার মধ্যে সাহিত্যপরিষদ অন্যতম। আমাদের অবহেলায় এই ক্ষীণ প্রদীপটি কি নিবিয়া যাইবে?

শতাধিক বৎসর পূর্বে আমাদের বংশের জননী প্রপিতামহী দেবী তরুণ যৌবনে বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র শিশুসন্তান লইয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার লইয়া প্রপিতামহী দেবী যখন নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন তখন একদিন তাঁহার শিশুপুত্র শিক্ষকের তাড়নায় অন্তঃপুরে আসিয়া মাতার অঞ্চল ধারণ করিয়াছিল। যিনি তাঁহার সমুদয় শক্তি একমাত্র পুত্রের উন্নতিকল্পে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিতেছিলেন, সেই স্নেহময়ী মাতা মুহূর্তে তেজস্বিনীরূপ ধারণ করিয়া পুত্রের হস্তপদ বাঁধিয়া তাহাকে শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভাবিয়া দেখিলে আমাদের মাতৃভূমি আমার তেজস্বিনী বংশ-জননীর মতো। সন্তানদিগকে বিক্রম ও পৌরুষে উদ্দীপ্ত হইতে তাড়া দিয়া তিনি তাহাদের প্রতি আপনার গভীর বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে অঙ্কে রাখিয়া আলস্যে কালহরণ করিতে দেন নাই; কিন্তু জগতের অগ্নিময় কর্মশালে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন, 'পৃথিবীর সংগ্রামময় কর্মক্ষেত্রে যখন যশঃ, বিক্রম ও পৌরুষ সংগ্রহ করিতে পারিবে তখনই আমার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবে।' মাতার আদেশ পালন করিবার জন্য বহু শতাব্দী পূর্বে দীপঙ্কর হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। তাহার

পর হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত বহু বাঙালী ভারতের বহুস্থানে গমন করিয়া কর্ম, যশঃ ও ধর্ম আহরণ করিয়াছেন। এই বিক্রমপুর বিক্রমশালী সন্তানের জন্মভূমি, মনুষ্যত্বহীন দুর্বলের নহে। আমার পূজা হয়তো তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এই সাহসে ভর করিয়া আমি বহুদিন বিদেশে যাপন করিয়া জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। হে জননী, তোমারই আশীর্বাদে আমি বঙ্গভূমি এবং ভারতের সেবকরূপে গৃহীত হইয়াছি।

কি ঘটনাসূত্রে আমি এখানে সভাপতিরূপে আহূত হইয়াছি তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। কোন্ নিয়মে আমাদের দেশে কোনো এক সংকীর্ণ পথে খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে বিসদৃশ কার্যে নিয়োগ করা হয় তাহার কারণ নির্দেশ করা কঠিন। যে যুক্তি অনুসারে ব্যবহারজীবীকে কলকারখানার ডিরেক্টার করা হয় সেই নিয়মেই লোকালয় হইতে দূরে লুক্কায়িত শিক্ষার্থী আজ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিয়োজিত হইয়াছে। এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ আপনারা গ্রহণ করেন নাই। আপনাদের প্রীতিকর কিছু যে আমি বলিতে পারিব সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। যে বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই সে বিষয়ে কিছু বলিতে উদ্যম করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমি স্বীয় জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি কেবল সেই বিষয়েই কিছু বলিব। পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া আমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে, আমাদের সমুদয় শিক্ষা-দীক্ষা কেবল

মনুষ্যত্বলাভের উদ্দেশ্যে মাত্র। কি করিয়া আমরা দুর্বলের ক্রন্দন ও স্ত্রীজনসুলভ মান অভিমান ও আবদার ত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত শক্তিবলে স্বহস্তে স্বীয় অদৃষ্ট গঠন করিতে পারি, তাহাই যেন আমাদের একমাত্র সাধনা হয়।

জীবনসংগ্রাম

জীবনসংগ্রামে যে কেবল শক্তিমানই জীবিত থাকে, দুর্বল নির্মূল হয়, এ কথা কেবল নিম্ন জীবের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য মনে করিতাম। কিন্তু পৃথিবী-ভ্রমণের ফলে এ ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, বিশ্বব্যাপী আহবে দুর্বল উচ্ছিন্ন হইবে এবং সবল প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনে করিবেন না যে, আমরা এখনও দূরে আছি বলিয়া এই খাণ্ডবদাহ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। বহুদিন হইতেই এই ভীষণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে।

অহিফেন সেবনে অতি সহজেই নানা কষ্ট হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারা যায়। সুতরাং অতীত গৌরব স্মরণই আমাদের পক্ষে বর্তমান দুরবস্থা ভুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আর এই-যে সম্মুখে ম্যালেরিয়াতে জনপদ নির্মূল হইতেছে, দেশী শিল্প জাপানের প্রতিযোগিতায় উচ্ছিন্ন হইতেছে, এ সব কথা ভাবিতে নাই। আমাদের জড়তা সম্বন্ধে যদি আমি কোনো তীব্র ভাষা ব্যবহার করি তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। আমার জীবনে যদি কোনো সফলতা দেখিয়া থাকেন তবে জানিবেন,

তাহা সর্বদা নিজেকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিবার ফলে। স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে ; যদি বাঁচিতে চাও তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখো।

বিবিধ সংক্রামক রোগ যেন দেশকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে চলিল। এই সব বিপদ একেবারে অনিবার্য নয়, কিন্তু এ আমাদের অজ্ঞতা ও চেষ্টাহীনতারই বিষময় ফল। যে পুকুর হইতে পানীয় জল গৃহীত হয় তাহার অপব্যবহার সভ্যতার পরিচায়ক নহে। কি করিয়া এই সব অজ্ঞতা দূর হইতে পারে? স্কুল বৃদ্ধি অতি মন্থর গতিতে হইতেছে ; আর-কোনো কি উপায় নাই যাহা দ্বারা অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় সহজে প্রচারিত হইতে পারে? আমাদের সর্বসাধারণে শিক্ষাবিস্তারের চিরন্তন প্রথা কথকতা দ্বারা। তাহা ছাড়া চক্ষে দেখিলে একটা বিষয়ে সহজেই ধারণা হয়। আমার বিবেচনায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় গৃহ ও পল্লী পরিষ্কার, বিশুদ্ধ জল ও বায়ুর ব্যবস্থা নির্ধারণ। এ সব বিষয়ে শিক্ষাবিস্তার এবং আদর্শ-গঠিত পল্লী প্রদর্শন অতি সহজেই হইতে পারে। ইহার উপায় মেলা স্থাপন। পর্যটনশীল মেলা দেশের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই অন্য প্রান্তে পৌঁছিতে পারে। এই মেলায় স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ছায়া-চিত্রযোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রচলন, যাত্রা, কথকতা, গ্রামের শিল্প-বস্তুর সংগ্রহ, কৃষি-প্রদর্শনী ইত্যাদি গ্রামহিতকর বহুবিধ কার্য সহজেই সাধিত হইতে পারে।

আমাদের কলেজের ছাত্রগণও এই উপলক্ষে তাঁহাদের দেশ-পরিচর্যাবৃত্তি কার্যে পরিণত করিতে পারেন।

লোকসেবা

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের দেশের ছাত্রগণ বহুবিধ রূপে লোকসেবায় আশ্চর্য পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। 'পতিতের সেবা' অথবা 'ডিপ্রেস্‌ড্‌ মিশনে'ও অনেকের ঐকান্তিক উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ইহা বিশেষ শুভ লক্ষণ। এই সম্বন্ধেও কিছু ভাবিবার আছে। শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাংলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজি স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশির পুত্র এবং বামে এক ধীবর-পুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ছুটির পর যখন বয়স্যদের সহিত আমি বাড়ি ফিরিতাম তখন মাতা আমাদের আহার্য বণ্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু এই কার্যে যে তাঁহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে করিতেন না। ছেলেবেলায় সখ্যতা-হেতু ছোটো জাতি

বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাঁকুড়ায় 'পতিত অস্পৃশ্য' জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছিল। যাঁহারা যৎসামান্য আহার্য লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া মুমূর্ষু স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার্য পাইয়া তাহা দশজনের মধ্যে বণ্টন করিল। ইহার পর প্রচলিত ভাষার অর্থ করা কঠিন হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত, উহারা না আমরা ?

আর এক কথা। তুমি ও আমি যে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে ? এই বিস্তৃত রাজ্য-রক্ষার ভার প্রকৃতপক্ষে কে বহন করিতেছে ? তাহা জানিতে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন করো। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই 'পতিত' শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই ; কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির-বেদনা নিহিত আছে।

শিল্পোদ্ধার

সম্প্রতি এই বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, সরকারী এক জন ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেই আমাদের দেশের শিল্পোদ্ধার হইবে। ডিরেক্টর মহোদয় সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান নহেন। এই সমস্ত গুণের সমন্বয়েও বিধাতাপুরুষ আমাদের দুর্গতি দূর করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে যাহাতে আমরা একান্ত বিমুখ। জাপানে অবস্থানের কালে দেখিলাম যে, ভারতবাসী-ছাত্রগণ তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে ভারতবাসীর কোনো স্থান নাই। জাপানী কিন্তু ঐ অবস্থাতেই সিদ্ধমনোরথ না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সে নিজের নিষ্ফলতার কারণ অন্যের উপর ন্যস্ত করে না। আমাদের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ কি? কারণ এই যে, চরিত্রে আমাদের বল নাই, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' এ কথা আমরা কেবল মুখেই বলিয়া থাকি। আমি জানি যে, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশী শিল্পের জন্য সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন। বহুদিনের চেষ্টার পর তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ ব্যবহার্য বস্তু উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের ব্যবসায় যে স্থায়ী হইবে তাহার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, এ-পর্যন্ত

তাঁহারা একজনও কর্মকুশল ও কর্তব্যশীল পরিচালক দেখিতে পাইলেন না।

কেরানিবাবু শত শত পাওয়া যাইতেছে; তাহাদের কেবল কলমের ও মুখের জোর। বিদেশে দেখিয়াছি, ক্রোড়পতির পুত্রও ব্যবসায় শিক্ষার সময় আপিসে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেখানকার সমস্ত কার্য স্বহস্তে করিয়া সম্যক্ শিক্ষালাভ করে। আমাদের দেশে অল্পতেই লোকের মান ক্ষয় হয়। আমাদের দেশের ছাত্র, যাহারা আমেরিকা যাইয়া সেখানকার রীতি অনুসারে কোনো কার্য হীন জ্ঞান করে নাই; এমন-কি, দারোয়ানী করিয়া এবং বাসন ধুইয়া বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করিয়াছে, এখানে আসিয়াই তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ভুলিয়া বিদেশীর বাহ্য ধরন-ধারণ অবলম্বন করে। তখন তাহাদের পক্ষে অনেক কার্য অপমানকর মনে হয়।

এ সব সম্বন্ধে সম্প্রতি জাপান হইতে প্রত্যাগত জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে, সেখানে আমাদের সম্বন্ধে দুই-একটি আমোদজনক কথা চলিতেছে। তাহাদিগের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে নাকি আমাদের গৃহিণীদের পট্টবস্ত্র হইতে হাতের চুড়ি পর্যন্ত সংগ্রহ হয় না। এখন বাঙালী বাবুদের জন্য তাহাদিগকে হুকার কল্কে পর্যন্তও প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত তোমরা ইউরোপের উপেক্ষা বহন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছ, এখন হইতে এশিয়ারও হাস্যাস্পদ হইতে চলিলে! আমাদের

দুর্বলতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করিলে কোনোদিন কি শিল্পে সার্থকতা লাভ করিতে পারিব ?

মানসিক শক্তির বিকাশ

শিল্পের উন্নতির আর-এক প্রতিবন্ধক এই যে, বিদেশে শিক্ষা করিয়া উহার ঠিক সেইমত কারখানা এ দেশের ভিন্ন অবস্থায় পরিচালন করিতে গেলে তাহা সফল হয় না। অনেক কষ্টে এবং বহু বৎসর পরে যদি বা তাহা কোনো প্রকারে কার্যকরী হয় তাহা হইলেও অতদিনে পূর্বপ্রচলিত উপায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। পরের অনুকরণ করিতে গেলে চিরকালই এইরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইবে। কোনোদিন কি আমাদের দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বর্ধিত হইবে না, যাঁহারা কেবল শ্রুতিধর না হইয়া স্বীয় চিন্তাবলে উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার করিতে পারিবেন ?

যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞান-শক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও তখন আমাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী। জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কত কাল এই অপমান সহ্য করিবে? তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না? ভাবিয়া দেখো, এক সময়ে দেশদেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিত। তক্ষশিলা, কাঞ্চী ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? বিক্রমপুর যে শিক্ষার এক পীঠস্থান ছিল তাহা কি স্মরণ নাই? ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ থাকিবে, সম্প্রতি তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা দেবতার করুণা বলিয়া মানিতে হইবে; এই সৌভাগ্য যেন চিরস্থায়ী হয়, ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত নহে? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার, কোথায় সেই শিষ্যবৃন্দ? এই সব আশা কি কেবল স্বপ্নমাত্রই থাকিবে? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, চেষ্টার বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইহা আমি জীবনে বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অজ্ঞ হিন্দুরমণী কেবল বিশ্বাসের বলেই বহু দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞানমন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব?

মুষ্টিমেয় ভিক্ষার ফলে ভারতের বহু স্থানে বিশাল বৌদ্ধবিহার

স্থাপিত হইয়াছে। অজ্ঞানই যে ভেদসৃষ্টির মূল এবং তোমাতে ও আমাতে যে কোনো পার্থক্য নাই, ইহা কেবল ভারতই সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই বিশাল একত্বের ভাব কি জ্ঞান ও সেবার দ্বারা জগৎকে পুনঃ প্লাবিত করিবে না ?

ভয় করিতেছে কি, সমস্ত জীবন দিয়াও এই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে না ? তোমার কি কিছুমাত্র সাহস নাই ? দ্যূতক্রীড়কও সাহসে ভর করিয়া জীবনের সমস্ত ধন পণ করিয়া পাশা নিক্ষেপ করে। তোমার জীবন কি এক মহাক্রীড়ার জন্য ক্ষেপণ করিতে পার না ? হয় জয় কিংবা পরাজয় !

বিফলতা

যদিই বা পরাজিত হইলে, যদিই বা তোমার চেষ্টা বিফল হইল, তাহা হইলেই বা কি ? তবে এক বিফল জীবনের কথা শোনো— ইহা অর্ধ শতাব্দীর পূর্বের কথা। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি অতদিন পূর্বেও দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোনো উপায় নাই। দেশে যখন কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহার জন্য তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত বিসর্জন দিয়াছিলেন। যাহারা প্রথম পথপ্রদর্শক হন তাঁহাদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নূতন উদ্যমে তিনি বহু ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের সুবিধার জন্য তাঁহারই প্রযত্নে সর্বপ্রথমে ফরিদপুরে

লোন্ আপিস স্থাপিত হয়। এখানে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব পরকে দিয়াছিলেন। এখন তাহাতে শতগুণ লাভ হইতেছে। তাঁহারই প্রযত্নে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ফরিদপুরে মেলা স্থাপিত হয়। তিনি আসামে স্বদেশী চা বাগান স্থাপন করেন। তাহাতেও তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার অংশীদারগণ এখন বহুগুণ লাভ করিতেছেন। তিনিই প্রথমে নিজ ব্যয়ে টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন এবং তাহার পরিচালনে সর্বস্বান্ত হন। জীবনের শেষ ভাগে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ? হয়তো এ কথা তাঁহার নিজ জীবনে প্রযোজ্য হইতে পারে ; কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহু জীবন সফল হইয়াছে। আমি আমার পিতৃদেব ৺ভগবানচন্দ্র বসুর কথা বলিতেছিলাম। তাঁহার জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে, সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপে যখন ফল ও নিষ্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোনো সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

হে বঙ্গবাসী, বর্তমান দুর্দিনের কথা এখন ভাবিয়া দেখো। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, অকূল জলধি এবং হিমাচল তোমাদিগকে সমগ্র পৃথিবী হইতে নিঃসম্পর্ক রাখিতে পারিবে না? তুমি কি বুঝিতে পার না যে, অতিমানুষী শক্তি ও

জ্ঞানসম্পন্ন পরাক্রান্ত জাতির প্রতিযোগিতার দরুন সংঘর্ষের মধ্যে তুমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছ? তুমি কি তোমার ক্ষীণশক্তি ও জীবন লইয়া জাতীয় জীবন চিরজীবনের মতো প্রবাহিত রাখিবে আশা করিতেছ? তুমি কি জান না যে, ধরিত্রীমাতা যেমন পাপভার বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি-জননীও সেইরূপ অসমর্থ জীবনের ভার বহন করিতে বিমুখ? প্রকৃতি-মাতার এই আপাতক্রূর নির্মম প্রকৃতিতেই তাঁহার স্নেহের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে। রুগ্‌ণ ও দুর্বল কতকাল জীবনের যন্ত্রণা বহন করিবে? বিনাশেই তাহার শান্তি, ধ্বংসই তাহার পরিণাম। আসিরিয়া, বেবিলন, মিশর ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! তোমার কী আছে, যাহার বলে তুমি জগতে চিরজীবী হইতে আকাঙ্ক্ষা কর? বোধ হয় পূর্বপিতৃগণের অর্জিত পুণ্য এখনও কিয়ৎ-পরিমাণে সঞ্চিত আছে; সেই পুণ্যবলেই বিধাতা তোমার অবসন্ন মস্তক হইতে তাঁহার অমোঘ বজ্র সংহত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই দেশে এখনও ভগবান তথাগতের মন্দির ও বিহারের ভগ্ন চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভগবান বুদ্ধদেবের সম্মুখে বহু তপস্যালব্ধ নির্বাণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল তখন সুদূর জগৎ হইতে উত্থিত জীবের কাতর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সিদ্ধ পুরুষ তখন তাঁহার দুষ্কর তপস্যালব্ধ মুক্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন। যতদিন পৃথিবীর শেষ

ধূলিকণা দুঃখচক্রে পিষ্ট হইতে থাকিবে ততদিন বহুযুগ ধরিয়া তিনি তাহার দুঃখভার স্বয়ং বহন করিবেন। কথিত আছে, পঞ্চশত জন্মপরম্পরায় সুগত জীবের দুঃসহ দুঃখভার বহন করিয়াছিলেন। এইরূপে যুগে যুগে দেবোপম মহাপুরুষগণ মানবের ক্লেশভার লাঘব করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই যুগ কি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? নরের দুঃখপাশ ছেদন করিবার জন্য ঈশ্বরের লীলাভূমি এই দেশে কি মহাপুরুষগণের পুনরায় আবির্ভাব হইবে না? পূর্বপিতৃগণের সঞ্চিত পুণ্যবল ও দেবতার আশীর্বাদ হইতে আমরা কি চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছি? যখন নিশির অন্ধকার সর্বাপেক্ষা ঘোরতম তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে, স্বার্থপরতায় এবং পরশ্রীকাতরতায়! ভাঙিয়া দাও এসব অন্ধকারের আবরণ! তোমাদের অন্তর্নিহিত আলোকরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত উজ্জ্বল করুক।

পূর্বে বাংলা মাসিকপত্রে উদ্ভিদ্-জীবন লইয়া যে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে বলিয়াছিলাম যে, উদ্ভিদ্-জীবন মানব-জীবনেরই ছায়া মাত্র। সেই প্রবন্ধটি লিখিতে এক ঘণ্টারও অধিক সময় লাগে নাই। কিন্তু সেই বিষয়টির কিয়দংশ মাত্র প্রতিষ্ঠা করিতে বহু বৎসর গিয়াছে। অতি সামান্য দ্রব্য গঠন করিতে অনেক চেষ্টা, অনেক অধ্যবসায়, অনেক পরিশ্রম এবং অনেক কলকারখানার আবশ্যক। কিন্তু মন কোনো বাঁধন মানে না। উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা নিমেষে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া আসে। মুহূর্তে স্বকল্পিত সত্য-মিথ্যা মিথ্যা-ঘটিত নূতন রাজ্য সৃজন করে এবং সে রাজ্য স্থাপনে যদি কেহ বাধা দেয় তাহা হইলে মানস-সম্ভব অক্ষৌহিণী সৈন্য ও অগ্নিবাণ -সাহায্যে বিপক্ষ নাশ করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করে।

কিন্তু কার্য-জগতের কথা অন্যরূপ ; এখানে পদে পদে বাধা। সমস্ত জীবনের চেষ্টা দিয়াও নিজের জীবন শাসন করিতে পারিলাম না, ইহা জানিয়াও নিজের কর্তব্য ভুলিয়া পরের কর্তব্য নির্ধারণ করিবার বাসনা দূর হয় না। কঠিন পথ ত্যাগ করিয়া যাহা সহজ এবং যাহা কথা বলিয়াই নিঃশেষিত হয়, সেইদিকে ইচ্ছা স্বতঃই ধাবিত হয়।

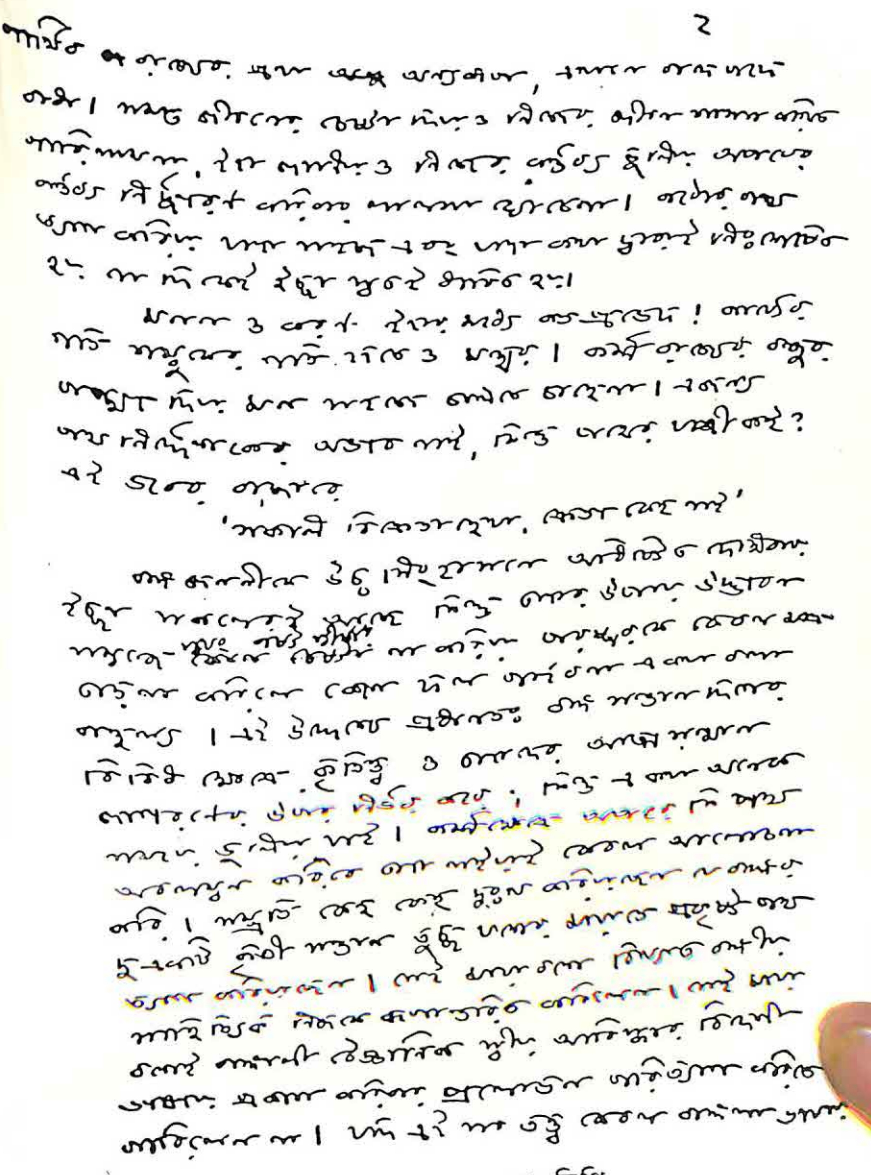
মনন ও করণ ইহার মধ্যে কত প্রভেদ! কার্যের গতি শম্বুকের গতি হইতেও মন্থর। কর্ম-রাজ্যের কঠিন পথ দিয়া

মন সহজে চলিতে চাহে না। এজন্য পথ-নির্দেশকের অভাব নাই ; কিন্তু পথের যাত্রী কই এই ভবের বাজারে ?

'সকলে বিক্রেতা হেথা, ক্রেতা কেহ নাই।'

বঙ্গজননীকে উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে ; কিন্তু তাহার উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে স্বয়ং কষ্ট স্বীকার না করিয়া পরস্পরকে কেবলমাত্র তাড়না করিলে কোনো ফল পাইব না, এ কথা বাহুল্য। এই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ বঙ্গ-সন্তানদের বিবিধ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ জাগরণ আবশ্যক ; কিন্তু একথা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। কর্মক্ষেত্রে অপরে কি পথ অবলম্বন করিবে তাহা লইয়াই কেবল আলোচনা করি। কেহ কেহ দুঃখ করিয়াছেন যে, বঙ্গের দুই একটি কৃতী সন্তান তুচ্ছ যশের মায়াতে প্রকৃষ্ট পথ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই মায়াবশেই বাঙালী-বৈজ্ঞানিক স্বীয় আবিষ্কার বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। যদি এই সকল তত্ত্ব কেবল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইত তাহা হইলে বিদেশীরা অমূল্য সত্যের আকর্ষণে এদেশে আসিয়া বাংলা ভাষা শিখিতে বাধ্য হইত এবং প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্য মস্তক অবনত করিত।

ইংরেজি ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার যাহা-কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা সর্বাগ্রে মাতৃভাষায়



মনন ও করণ প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি

প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ-সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের সুধীশ্রেষ্ঠদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ও বিদেশের হল্‌-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোনো সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বাংলা দেশে আবিষ্কৃত, বাংলা ভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন বাংলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল তখন বিদেশী ডুবুরিগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে রত্ন উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা দুরাশা মাত্র।

যে সকল বাধার কথা বলিলাম, তাহার পশ্চাতে যে কোনো এক অভিপ্রায় আছে তাহা এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি। বুঝিতে পারিয়াছি, সত্যের সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠা প্রতিকূলতার সাহায্যেই হয়, আর আনুকূল্যের প্রশ্রয়ে সত্যের দুর্বলতা ঘটে। বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশ্বমেধের যজ্ঞীয় অশ্বের মতো সমস্ত শত্রুরাজ্যের মধ্য দিয়া জয়ী করিয়া আনিতে না পারিলে যজ্ঞ সমাধা হয় না। এই কারণেই আমি যে সত্য-অন্বেষণ জীবনের সাধনা করিয়াছিলাম তাহা লইয়া গৌরব করা কর্তব্য মনে করি নাই; তাহাকে জয়ী করাই আমার লক্ষ্য ছিল। আজিকার দিনে বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরাট রণক্ষেত্র পশ্চিম দেশে প্রসারিত। পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালীর যেরূপ দুর্নাম ছিল, বিজ্ঞানক্ষেত্রেও

ভারতবাসীদের সেইরূপ নিন্দা ঘোষিত হইত। তাহার বিরুদ্ধে যুঝিতে যাইয়া আমি বারংবার প্রতিহত হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ-জীবনে ব্যর্থতাই আমার সাধনার পরিণাম হইবে। কিন্তু ঘোরতর নিরাশার মধ্যেও আমি অভিভব স্বীকার করি নাই। তৃতীয়বার পশ্চিম-সমুদ্র পার হইলাম এবং বিধাতার বরে সার্থকতা লাভ করিতে পারিলাম। এই সুদীর্ঘ পরিণামে যদি জয়মাল্য আহরণ করিয়া থাকি তবে তাহা দেশ-লক্ষ্মীর চরণেই নিবেদন করিতেছি।

সত্য বটে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে-সকল অমর তত্ত্ব রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দুই চারিজন বিদেশী কষ্ট স্বীকার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে কারণে প্রতীচ্য বর্তমান যুগের প্রাচ্যের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে, এরূপ কোনো লক্ষণ দেখি না। গ্রীক এবং ইউরোপীয় সভ্যতা প্রাচীন মিশর-সভ্যতার নিকট বহু ঋণে ঋণী ; কিন্তু সেই মিশর জাতির বংশধর ফেলা-হীন আজ জগতে ঘৃণ্য। হে বেদ-উপনিষদ রচয়িতার বংশধর, হে ভারতীয় ফেলাহীন, আজ তোমার স্থান কোথায় ?

হায় আলনস্কর, তোমার দিবাস্বপ্ন কি কোনোদিন ভাঙিবে না ? তোমার পণ্যদ্রব্য শুধু গিল্টি ও কাচ। স্বর্ণ ও হীরক বলিয়া তাহা বিক্রয় করিবে মনে করিয়াছিলে এবং অলীক ধনে আপনাকে ধনী মনে করিয়া ভাগ্যলক্ষ্মীকে পদাঘাত করিলে। দর্শকগণের উপহাস এত অল্পদিনেই ভুলিয়াছ ? কি বলিতেছ ?

তোমার পূর্বপুরুষগণ ধনী ছিলেন, তাঁহারা পুষ্পকরথে বিমানে বিহার করিতেন! মূঢ়, তবে কি করিয়া সেই সম্পদ হারাইলে? চাহিয়া দেখো— দূরে যে ধবল পর্বত দেখিতেছ তাহা নরকঙ্কালে নির্মিত। তুমি যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া মনে কর, উহা তাহাদেরই অস্থিস্তূপ। দেখো, কাহারা সেই অস্থিনির্মিত সোপান বাহিয়া গিরিশৃঙ্গে উঠিয়াছে এবং শূন্যে ঝাঁপ দিয়া নীলাকাশে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। উড্ডীয়মান শ্যেন-পক্ষীশ্রেণী বলিয়া যাহা মনে করিয়াছ, দেখিতে দেখিতে সেগুলি মেঘের অন্তরালে অন্তর্হিত হইল। অবাক হইয়া তুমি ঊর্ধ্বে চাহিয়া আছ। অকস্মাৎ মেঘরাজ্য হইতে নিক্ষিপ্ত বহ্নিশেল তোমার চতুর্দিকে পৃথিবী বিদীর্ণ করিল। কোথায় তুমি পলায়ন করিবে? গহ্বরে প্রবেশ করিয়াও নিস্তার নাই। বিষ-বাহক বাষ্পে তোমাকে সে স্থান হইতেও বাহির হইতে হইবে।

কথার গ্রন্থিবন্ধনে আমরা যে জাল বিস্তার করিয়াছি, সেই জালে আপনারাও আবদ্ধ হইয়াছি। সে জাল কাটিয়া বাহির হইতে হইবে। মাতৃদেবীকে অযথা সভাস্থলে আনিয়া তাঁহার অবমাননা করিও না। হৃদয়-মন্দিরেই তাঁহার প্রকৃত পীঠস্থান; জীবন-উৎসর্গই তাঁহার পূজার উপকরণ।

একদিন সম্মুখের গলির মোড়ে দেখিলাম, এক ভিক্ষুক বিকট অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া পথ-যাত্রীর করুণা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটা একেবারেই ভণ্ড; প্রতারণা করিয়া সকলকে ঠকাইতেছে বলিয়া আমার রাগ হইল। এই সময় সেখান দিয়া একটি স্ত্রীলোক যাইতেছিল। তাহার পরনে ছেঁড়া কাপড়। ভিক্ষুকের কান্না শুনিয়া স্ত্রীলোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া দেখিল। তাহার অঞ্চল-কোণে একটি মাত্র পয়সা বাঁধা ছিল; হয়তো তাহাই তাহার সর্বস্ব। বিনা বাক্যব্যয়ে সে সেই পয়সাটি ভিক্ষুককে দিয়া চলিয়া গেল। সেই দিনেই আমার প্রকৃত রানী-সন্দর্শন লাভ হইয়াছিল— মাতৃরূপিণী জগদ্ধাত্রী রানী! এইজন্যই তো বয়স নির্বিশেষে ছোটো মেয়ে হইতে বর্ষীয়সী পর্যন্ত সকল নারীকেই আমরা মা বলিয়া সম্বোধন করি।

বাঘিনী মাতৃস্নেহে মমতাপন্ন হয়। একবার ১০।১২ বৎসরের একটি ছেলে দেখিলাম। শিশুকালে নেকড়ে-বাঘিনী তাহাকে লইয়া যায়। ক্ষুধার্ত শিশু বাঘিনীর স্তন্যপান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; তাহাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইল। সেই অবধি বাঘিনী স্বীয় শাবকের ন্যায় তাহাকে পালন করিয়াছিল। কিন্তু শাবকদিগের প্রাণরক্ষার জন্য সে অন্য মূর্তি ধরিয়াছিল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছিল। মাতৃস্নেহে দুইটি রূপ

দেখা যায় ; উভয়ই আশ্রিতের রক্ষা-হেতু। একটি মমতাপন্না করুণাময়ী, অন্যটি সংহাররূপিণী শক্তিময়ী।

নারীর হৃদয়ের যে সন্তান-স্নেহ উথলিত হইয়া সমস্ত দুস্থ-জনকে সন্তানজ্ঞানে আগুলিয়া রাখিবে তাহা আশ্চর্য নহে। এতদ্ব্যতীত নারী স্বতঃই অভিমানিনী ; প্রিয়জনের অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাকে মর্মে মর্মে বিদ্ধ করে। হে অভিমানিনী রমণী, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, তুমি যাহার গৌরবে গৌরবিনী, এ জগতে তাহার স্থান কোথায়? পৃথিবী হইতে শান্তি পলায়ন করিয়াছে, সম্মুখে ঘোর দুর্দিন। যাহার উপর তুমি নির্ভর করিয়া আছ, সে কি সেই দুর্দিনে তোমাকে ঘোরতর লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? বাক্য ছাড়া যে তাহার আর কোনো অস্ত্র নাই। কে তাহার বাহু সবল করিবে, হৃদয়ের শক্তি দুর্দম রাখিবে এবং মৃত্যুর বিভীষিকার অতীত করিবে? এ সকল শিক্ষা তো মাতৃ-ক্রোড়েই হইয়া থাকে। কি তোমার দীক্ষা, যাহা দিয়া তুমি সন্তানকে মানুষ করিয়া গড়িবে? কৃচ্ছ্রসাধনা অথবা বিলাসিতা—ইহার কোন্ পথ তুমি গ্রহণ করিবে? রানী হইয়া জন্মিয়াছিলে, দাসী হইয়াই কি তুমি মরিবে?

নিবেদন

বাইশ বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম তাহা এতদিন পরে দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক-সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। যে আলো চক্ষুর অদৃশ্য ছিল তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করা আবশ্যক। শরীর-নির্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয় তখন ধাতুনির্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্য-নির্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে; কিন্তু আরও অনেক ঘটনা আছে যাহা সেই ইন্দ্রিয়েরও অগোচর, তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও

পরীক্ষা আছে ; তাহা দুই-একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহাসত্য যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল ? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোনো উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না ; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে ; কিন্তু যাঁহারা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদেরই জন্য।

পরীক্ষা

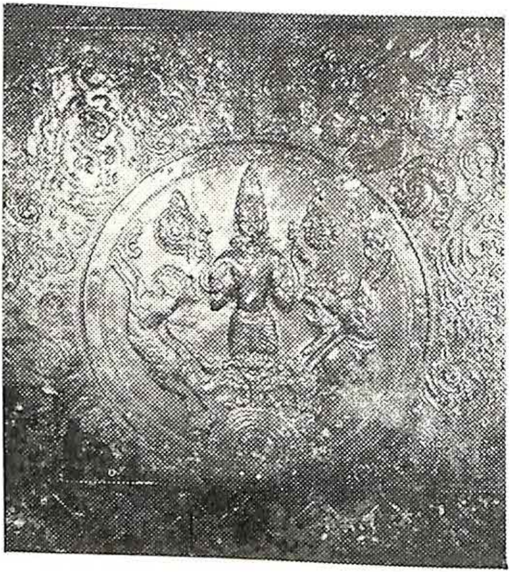
যে পরীক্ষার কথা বলিব তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদ্-জীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বাস-রাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্য সম্বন্ধে যে দুই-একটি কথা বলিব তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া ; তাহা অর্ধ শতাব্দী পূর্বের কথা। তাঁহারই

নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনি শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব-বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। জনহিতকর নানা কার্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোনো কোনো বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহুদেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবল ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোনোদিনই তাহাদের নহে, সেই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনোদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সে-ই বৃথা



বিজ্ঞান ও কল্পনার জয়যাত্রা
শ্রীনন্দলাল বসু -অঙ্কিত



উদয়সবিতা
শ্রীনন্দলাল বসু -পরিকল্পিত

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধরিয়া একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়-পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জার্মানীতে আচার্য হার্টস বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোনো এক প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ যখন পাঠ করি তখন সভাস্থ কোনো সভ্যই আমার কার্য সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না। বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্তমান কালের সর্বপ্রধান

পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পরে তাহার উত্তর পাইলাম। তাহাতে অবগত হইলাম যে, আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায়ক হইবে বলিয়া পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্যে নিয়োজিত হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল। আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সেই দিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা কখনও নির্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা এক দিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোনো অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একই রূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যের

বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটির সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে প্রচলিত মত-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই-একজন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, আমার স্বীয় গণ্ডি ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরও দুই-একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, বহু বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল একদিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর। বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই যে, যদি কেহ কোনো বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য থাকে,

কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনোদিন দেখিতে পাইবেন, বারংবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী পর্যটন

ভাগ্য ও কার্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে— তাহার নিয়ম— উত্থান, পতন, আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন হুর্দিন আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সে দুর্যোগও একদিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য ভারত-গভর্নমেণ্ট ১৯১৪ খৃস্টাব্দে আমাকে পৃথিবী পর্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্বিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালিফোর্নিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী; অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জার্মান অধ্যাপক ফেফারের অর্ধ শতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোনো কোনো আবিষ্ক্রিয়া ফেফারের কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে ; তাঁহার দুঃখ রহিল যে, এই সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ-জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরীভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই তো চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে এই বীরধর্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়শিষ্য অর্জুনের।

পৃথিবী পর্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন

পণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্বসংকল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়। আমার কার্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন তাঁহাদের পথ যেন কোনোদিন অবরুদ্ধ না হয়।

বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের দান

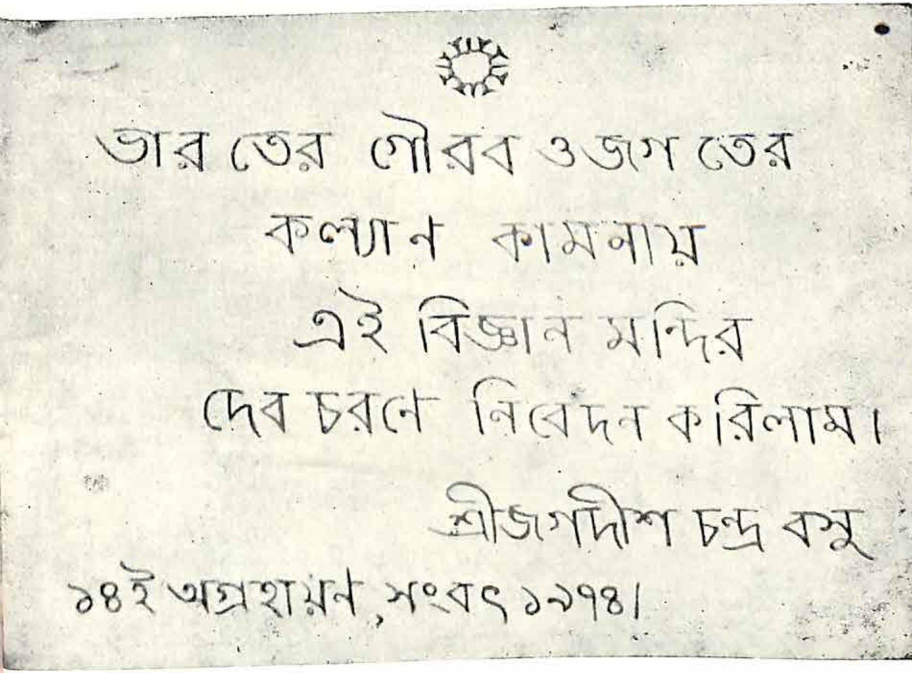
বিজ্ঞান তো সার্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন-কি কোনো স্থান আছে যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্তমানকালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্যদেশে কার্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে তাহা বোধগম্য হয় না। সতত চঞ্চল প্রাণী, আর এই চিরমৌন অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে এবং পরমুহূর্তেই

তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্যের পরীক্ষাপ্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এমন এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দুইটি চক্ষু এক সময়ে জাগরিত থাকে না ; পর্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর-একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপাত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য-আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্মাণকৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য ঘূর্ণমান বিদ্যুৎ-উর্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্বাক জীবনের উত্তেজনা মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধিমাত্রার পরিবর্তন মুহূর্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সংকুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একই বিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ

প্রয়োগ দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্ধিত বা মন্দীভূত হয় সেই একই কারণে উদ্ভিদ-স্নায়ুর আবেগও উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান আমার পরীক্ষাগারে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন-কি মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এক কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোনো বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দেশ করিয়া থাকেন তবে এই চতুর্বেণী-সংগমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহু শাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের বিকাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে-সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের


ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞান মন্দির
দেবচরণে নিবেদন করিলাম।
শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু
১৪ই অগ্রহায়ন, সংবৎ ১৯৭৪।

মন্দিরোৎসর্গ



বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ॥ সভাগৃহ

জন্য বীক্ষণাগার নির্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয় ; আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানের বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলে চিরজীবন চলিয়াছি ; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। 'হইতে পারে না' বলিয়া কোনোদিন পরাঙ্মুখ হই নাই ; এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্ত-হস্তেই ফিরিয়া যাইব ; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয় তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য আমার দুঃখ এবং পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনোদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন তখনও দুই-এক জনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল, কেবলমাত্র ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপরেই এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি যে আশায় কার্য আরম্ভ করিয়াছি তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আমি যে বৃহৎ সংকল্প করিয়াছিলাম

তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয়তো দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুইটি দিক আছে। প্রথমত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এস্থানে কোনো বহুচর্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে সেই সকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকা দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং হয়তো তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে।

আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহুশতাব্দী পূর্বে ভারতে জ্ঞান

সার্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি— ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুইটি দিক আছে; আমরা সেই দুইয়ের সংযোগস্থলে বর্তমান। এক দিকে জীবনের, অপর দিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবের স্পন্দন আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে তাহা আর উঠিবে না; অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের

ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয় তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আমরা একেবারে আচ্ছন্ন। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্তনাদবিহীন উদ্ভিদজগতে, এই তূষ্ণীম্ভূত অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতিশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজর, কোন্‌টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে তখন সেই সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম তবে ধনধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কী করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্বজয়ী নহে; জড়-সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য দেশ-বিজয়ে কোনোদিন স্থাপিত হয়

নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা কেবল বিতরণের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন— এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্ঘ্য

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরগাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকা-স্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত— যে দৈবঅস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবন দান করেন তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য অর্ধ আমলক মাত্র ; কিন্তু পূর্ব-দিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম কল্য হইতে পুনরায় কর্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব।

আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি। তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, হৃদয়মন্দিরে। তাঁহার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।

আমরা সকলেই শিক্ষার্থী, কার্যক্ষেত্রে প্রত্যহই শিখিতেছি, দিন দিন অগ্রসর হইতেছি এবং বাড়িতেছি।

জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই যে, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয় সেই দিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা। যেদিন হইতে আমাদের বড়ো হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে সেদিন হইতেই আমাদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে। তাহার জন্য কি করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য লাভ হইতে পারে একাগ্র-চিত্তে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

দ্রোণাচার্য শিষ্যগণের পরীক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'গাছের উপর যে পাখিটি বসিয়া আছে তাহার চক্ষুই লক্ষ্য ; পাখিটি কি দেখিতে পাইতেছ ?' অর্জুন উত্তর করিলেন, 'না, পাখি দেখিতে পাইতেছি না, কেবল তাহার চক্ষুমাত্র দেখিতেছি।' এইরূপ একাগ্রচিত্ত হইলেই বাহিরের বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবে।

তবে সেই লক্ষ্য কি ? লক্ষ্য, শক্তি সঞ্চয় করা, যাহা দ্বারা অসাধ্যও সাধিত হয়।

জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, শক্তি সঞ্চয় দ্বারাই জীবন পরিস্ফুটিত হয়। তাহা কেবল নিজের একাগ্র

চেষ্টা দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। যে কোনোরূপ সঞ্চয় করে না, যে পরমুখাপেক্ষী, যে ভিক্ষুক, সে জীবিত হইয়াও মরিয়া আছে।

যে সঞ্চয় করিয়াছে সেই-ই শক্তিমান্, সেই-ই তাহার সঞ্চিত ধন বিতরণ করিয়া পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালী করিবে। কে এই সাধনার পথ ধরিবে ?

এজন্য কেবল অল্প কয়জনকেই আহ্বান করিতেছি। দুই-এক বৎসরের জন্য নহে ; সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার জন্য। দেখিতেছ না ধূলিকণার ন্যায়, কীটের ন্যায় নিয়ত কত জীবন পেষিত হইতেছে। ভীষণ জীবনচক্রের গতি দেখিয়া ভীত হইয়াছ ? স্বভাবের নির্মম ও কাণ্ডারীহীন কার্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছ ? কিন্তু তোমাদেরই অন্তরে দৈব দৃষ্টি আছে, তাহা উজ্জ্বল করো। হয়তো প্রকৃতির মধ্যে একটা দিশা, একটা উদ্দেশ্য দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে যে, এই বিশ্ব জীবন্ত, জড়পিণ্ড মাত্র নহে। তাহার আহার উল্কাপিণ্ড, তাহার শিরায় শিরায় গলিত ধাতুর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সামান্য ধূলিকণাও বিনষ্ট হয় না, ক্ষুদ্র শক্তিও বিনাশ পায় না ; জীবনও হয়তো তবে অবিনশ্বর। মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোচ্ছ্বাস। দেখ, তাহারই বলে এই পুণ্য দেশ সঞ্জীবিত রহিয়াছে। সেবা দ্বারা, ভক্তি দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা মানুষ একই স্থানে উপনীত হয়। তোমরাও তাহার একটি

পথ গ্রহণ করো। জীবন ও তাহার পরিণাম, এই জগৎ ও অপর জগৎ তোমাদের সাধনার লক্ষ্য হউক। নির্ভীক বীরের ন্যায় জীবনকে মহাহবে নিক্ষেপ করো।

পশ্চিমে কয় বৎসর যাবৎ আকাশ ধূমে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দৃষ্টি পৌঁছিত না। অপরিস্ফুট আর্তনাদ কামানের গর্জনে পরাহত। কিন্তু যেদিন হইতে শিখ ও পাঠান, গুরখা ও বাঙালী সেই মহারণে জীবন আহুতি দিতে গিয়াছে, সেদিন হইতে আমাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বাড়িয়া গিয়াছে।

শুভ্র তুষার-প্রান্তর যাহাদের জীবনধারায় রক্তিম হইয়াছে তাহাদের অন্তিম বেদনা আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিতেছে। কি এই আকর্ষণ যাহা সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয়, যাহা নিকটকেও নিকটতর করে, যাহাতে পর ও আপন ভুলিয়া যাই? সমবেদনাই সেই আকর্ষণ, কেবল সহানুভূতি-শক্তিতেই আমাদের জীবনে প্রকৃত সত্য প্রতিভাত হয়। চিরসহিষ্ণু এই উদ্ভিদরাজ্য নিশ্চলভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উত্তাপ ও শৈত্য, আলো ও অন্ধকার, মৃদু সমীরণ ও ঝটিকা, জীবন ও মৃত্যু ইহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বিবিধ শক্তি দ্বারা ইহারা আহত হইতেছে, কিন্তু আহতের কোনো ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে না। এই অতি সংযত, মৌন ও অক্রন্দিত জীবনেরও যে এক মর্মভেদী ইতিহাস আছে তাহা বর্ণনা করিব।

মানুষকে আঘাত করিলে সে চীৎকার করে। তাহা হইতে মনে করি, সে বেদনা পাইয়াছে। বোবা চীৎকার করে না; কি

করিয়া জানিব, সে বেদনা পাইয়াছে ? সে ছট্‌ফট্‌ করে, তাহার হস্তপদ আকুঞ্চিত হয় ; দেখিয়া মনে হয়, সেও বেদনা পাইয়াছে। সমবেদনার দ্বারা তাহার কষ্ট অনুভব করি। ব্যাঙকে আঘাত করিলে সে চীৎকার করে না, কিন্তু ছট্‌ফট্‌ করে ; তবে মানুষ ও ব্যাঙে যে অনেক প্রভেদ ! ব্যাঙ বেদনা পাইল কি না, এ কথা কেবল অন্তর্যামীই জানেন। সমবেদনা সতত উর্ধ্বমুখী, কখনও কখনও সমতলগামী, ক্বচিৎ নিম্নগামী। ইতর লোকে যে আমাদের মতোই সুখ দুঃখ, মান অপমান বোধ করে, এ কথা কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন। ইতর জীবের তো কথাই নাই। তবে ব্যাঙ আঘাত পাইয়া যে কিছু-একটা অনুভব করে এবং সাড়া দেয়, এ কথা মানিয়া লইতেই হইবে। অনুভব করে— এই কথা, টের পায় এই অর্থে ব্যবহার করিব। মানুষ বেদনা পায়, ইতর জীব সাড়া দেয়, এই কথাতে কেহ কোনো আপত্তি করিবেন না। ব্যাঙের ছট্‌ফটানি দেখিয়া হয়তো অভ্যাস-দোষে কখনও বলিয়া ফেলিতে পারি যে, সে বেদনা পাইয়াছে। এ কথাটা রূপক অর্থে লইবেন। কথা ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ বিলাতের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলেন যে, খোলা ছাড়াইয়া জীবিত ঝিনুক অথবা অয়স্টারকে যখন গলাধঃকরণ করা হয় তখন ঝিনুক কোনো কষ্টই অনুভব করে না, বরঞ্চ পাক-গহ্বরের উষ্ণতা অনুভব করিয়া উল্লসিত হয়। ব্যাঘ্রের উদরস্থ হইয়া কেহ ফিরিয়া

আসে নাই, সুতরাং পাকস্থলীর অন্তর্গত হইবার সুখ চিরকাল অনির্বচনীয়ই থাকিবে।

জীবনের মাপকাঠি

এখন দেখা যাউক, জীবন্ত অবস্থার কোনোরূপ মাপকাঠি আছে কি না। জীবিত ও মৃতের কি প্রভেদ? যে জীবিত তাহাকে নাড়া দিলে সাড়া দেয়। কেবল তাহাই নহে; যে অধিক জীবন্ত সে একই নাড়ায় অতি বৃহৎ সাড়া দেয়। যে মৃতপ্রায় সে নাড়ার উত্তরে ক্ষুদ্র সাড়া দেয়। যে মরিয়াছে সে একেবারেই সাড়া দেয় না।

সুতরাং আঘাত দিয়া জীবন্ত ভাবের পরিমাণ করিতে পারি। যে তেজস্বী সে অল্প আঘাতেই পূর্ণ সাড়া দিবে। আর যে দুর্বল সে অনেক তাড়না পাইয়াও নিরুত্তর থাকিবে। মনে করুন, কোনোপ্রকারে আমার অঙ্গুলির উপর বার বার আঘাত পড়িতেছে। আঘাত পাইয়া অঙ্গুলি আকুঞ্চিত হইতেছে এবং তজ্জন্য নড়িতেছে। অল্প আঘাতে অল্প নড়ে এবং প্রচণ্ড আঘাতে বেশি নড়ে। শুধু চক্ষে তাহার পরিমাণ প্রকৃতরূপে লক্ষিত হয় না। আকুঞ্চনের মাত্রা ধরিবার জন্য কোনোপ্রকার লিখিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। সম্মুখে যে পরীক্ষা দেখানো হইয়াছে তাহা হইতে কলের আভাস পাওয়া যাইবে। স্বল্প আঘাতের পরে স্বল্প আকুঞ্চন; কলমটা উপরের দিকে অল্প দূর উঠিয়া যায়,

আকুঞ্চনরেখাও স্বল্প-আয়তনের হয়। বৃহৎ আঘাতে রেখাটা বড়ো হয়।

কেবল তাই নহে। আঘাতের চকিত অবস্থা হইতে আমরা পুনরায় প্রকৃতিস্থ হই; সংকুচিত অঙ্গুলি পুনরায় স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয়। আঘাত দিলে সংকুচিত অঙ্গুলির টানে লিখিত রেখা হঠাৎ উপর দিকে চলিয়া যায়। প্রকৃতিস্থ হইতে কিছু সময় লাগে; ঊর্ধ্বোত্থিত রেখা ক্রমশঃ নামিয়া পূর্ব স্থানে আসে। আঘাতের বেদনা অল্প সময়েই পূর্ণ মাত্রা হইয়া থাকে; কিন্তু সেই বেদনা অন্তর্হিত হইতে সময় লাগে। সেইরূপ আকুঞ্চনের সাড়া অল্প সময়েই হইয়া থাকে; তাহা হইতে প্রকৃতিস্থ হইবার প্রসারণ-রেখা অধিক সময় লয়। গুরুতর আঘাতে বৃহত্তর সাড়া পাওয়া যায়; প্রকৃতিস্থ হইতে দীর্ঘতর সময় লাগে। বেদনাও অনেক কাল স্থায়ী হয়। যদি জীবিত পেশী একই অবস্থায় থাকে এবং একইবিধ আঘাত তাহার উপর বার বার পতিত হয়, তাহা হইলে সাড়াগুলি একই রকম হয়। কিন্তু জীবিত পেশী সর্বসময়ে একই অবস্থায় থাকে না; কারণ বাহ্য জগৎ এবং বিগত ইতিহাস আমাদিগকে মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন রূপে গড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রকৃতি মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। কখনও বা উৎফুল্ল, কখনও বা বিমর্ষ, কখনও বা মুমূর্ষু। এই সকল ভিতরের পরিবর্তন অনেক সময় বাহির হইতে বুঝা যায় না। যিনি দেখিতে ভালোমানুষটি

তিনি হয়তো কোপনস্বভাব, অল্পেতেই সপ্তমে চড়িয়া বসেন; অন্যকে হয়তো কিছুতেই চেতানো যায় না। ব্যক্তিগত পার্থক্য, অবস্থাগত পরিবর্তন, তদ্ভিন্ন জীবনের অনেক ইতিহাস ও স্মৃতি আছে যাহার ছাপ অদৃশ্যরূপেই থাকিয়া যায়। সে সকল লুপ্ত কাহিনী কি কোনোদিন ব্যক্ত হইবে? প্রথমে মনে হয়, এই চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব। দেখা যাউক, অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে কি না। কি করিয়া লোকের স্বভাব পরখ করিব? সাচ্চা ও ঝুটার প্রভেদ কি? টাকা পরখ করিতে হইলে বাজাইয়া লইতে হয়; আঘাতের সাড়া শব্দরূপে শুনিতে পাই। সাচ্চা ও ঝুটার সাড়া একেবারেই বিভিন্ন; একটাতে সুর আছে, অন্যটা একেবারে বেসুর। মানুষের প্রকৃতিও বাজাইয়া পরখ করা যায়। অদৃষ্ট দারুণ আঘাত দিয়া মানুষকে পরীক্ষা করে; সাচ্চা ও ঝুটার পরীক্ষা কেবল তখনই হয়।

হয়তো এইরূপে জীবের প্রকৃতি ও তাহার ইতিহাস বাহির করা যাইতে পারে— আঘাত করিয়া এবং তাহার সাড়া লিপিবদ্ধ করিয়া। সাড়া-লিপি তো রেখা মাত্র; কোনোটা একটু বড়ো কোনোটা কিছু ছোটো। দুইটি রেখার সামান্য বিভেদ হইতে এমন অব্যক্ত, এমন অন্তরঙ্গ, এমন রহস্যময় ইতিহাস কিরূপে ব্যক্ত হইবে? কথাটা যত অসম্ভব মনে হয়, বাস্তবিক তত নয়। গ্রহবৈগুণ্যে হয়তো আমাদিগকে কোনোদিন আসামীরূপে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে। সেখানে

আসামীর বাগাড়ম্বর করিবার অধিকার নাই। কৌন্সুলির জেরাতে কেবল 'হাঁ' কি 'না' এইমাত্র উত্তর দিতে হইবে; অর্থাৎ কেবলমাত্র দুই প্রকার সাড়া দিতে পারিব— শিরের উর্ধ্বাধঃ অথবা দক্ষিণ-বামে আন্দোলন দ্বারা। যদি আসামীর নাকের উপর কালি মাখাইয়া সম্মুখে একখানি অতি শুভ্র স্ট্যাম্প-কাগজ ধরা যায় তাহা হইলে কাগজে দুই রকম সাড়া লিখিত হইবে। ইহাই প্রকৃত নাকে-খৎ এবং এই দুইটি রেখাময়ী সাড়া দ্বারা স্বয়ং ধর্মাবতার বিচারপতি আমাদের সমস্ত জীবন পরীক্ষা করিবেন। সেই বিচারের ফলেই আমাদের ভবিষ্যৎ বাসস্থান নিরূপিত হইবে— কলিকাতায় কিংবা আন্দামানে, ইহলোকে কিংবা পরলোকে।

এতক্ষণ মানুষের কথা বলিলাম। গাছের কথা ও তাহার গূঢ় ইতিহাসের কথা এখন বলিব। গাছের পরীক্ষা করিতে হইলে গাছকে কোনো বিশেষরূপে আঘাত দ্বারা উত্তেজিত করিতে হইবে এবং তাহার উত্তরে সে যে সংকেত করিবে তাহা তাহাকে দিয়াই লিপিবদ্ধ করাইতে হইবে। সেই লিখনভঙ্গী দিয়াই তাহার বর্তমান ও অতীত -ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে। সুতরাং এই দুরূহ প্রযত্ন সফল করিতে হইলে দেখিতে হইবে—

১. গাছ কি কি আঘাতে উত্তেজিত হয় এবং কিরূপে সেই আঘাতের মাত্রা নিরূপিত হইতে পারে?

২. আঘাত পাইয়া গাছ উত্তরে কিরূপ সংকেত করে?

৩. কি প্রকারে সেই সংকেত লিপিরূপে অঙ্কিত হইতে পারে ?

৪. সেই লেখার ভঙ্গী হইতে কি করিয়া গাছের ইতিহাস উদ্ধার হইতে পারে ?

৫. গাছের হাত, অর্থাৎ ডাল কাটিলে গাছ কি ভাবে তাহা অনুভব করে ?

গাছের উত্তেজনার কথা

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের কোনো অঙ্গে আঘাত করিলে সেখানে একটা বিকারের ভাব উৎপন্ন হয়। তাহাতে অঙ্গ সংকুচিত হয়। তদ্ভিন্ন আহত স্থান হইতে সেই বিকার-জনিত একটা ধাক্কা স্নায়ুসূত্র দিয়া মস্তিষ্কে আঘাত করে; তাহা আমরা আঘাতের মাত্রা ও প্রকৃতিভেদে সুখ কিংবা দুঃখ বলিয়া মনে করি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁধিলে যদিও নড়িবার শক্তি বন্ধ হয়, তথাপি সেই স্নায়ুসূত্র বাহিয়া যে সংবাদ যায় তাহা বন্ধ হয় না। বৃক্ষকে তার দিয়া বৈদ্যুতিক কলের সঙ্গে সংযোগ করিলে দেখা যায় যে, গাছকে আঘাত করিবামাত্র সে একটা বৈদ্যুতিক সাড়া দিতেছে। গাছের মৃত্যুর পর আর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। এইরূপে সকল প্রকার গাছ এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঘাত অনুভব করিয়া যে সাড়া দেয় তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

কোনো কোনো গাছ আছে যাহারা নড়িয়া সাড়া দেয়; যেমন লজ্জাবতী লতা। প্রতি পত্র-মূলের নীচের দিকে উদ্ভিদপেশী অপেক্ষাকৃত স্থূল। আমাদের মাংসপেশী আহত হইলে যেরূপ সংকুচিত হয়, পত্রমূলের নীচের দিকের উদ্ভিদ-পেশীও আঘাতে সেরূপ সংকুচিত হয়। তাহার ফলে পাতাটা পড়িয়া যায়। আঘাতজনিত আকস্মিক সংকোচের পরে গাছ প্রকৃতিস্থ হয় এবং পাতাটা আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হয়। মানুষ যেরূপ হাত নাড়িয়া সাড়া দেয়, লজ্জাবতী সেইরূপ পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়।

মানুষকে যেরূপে উত্তেজিত করা যায়, লজ্জাবতীকে ঠিক সেই প্রকারে—যেমন লাঠির আঘাত দিয়া, চিম্‌টি কাটিয়া, উত্তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা দিয়া, অ্যাসিডে পোড়াইয়া উত্তেজিত করা যাইতে পারে। এই সকল নাড়া পাইয়া পাতা সাড়া দেয়। তবে এই সকল ভীষণ তাড়না পাতা অধিক কাল সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করে। সুতরাং দীর্ঘকাল পরীক্ষার জন্য এমন কোনো মৃদু তাড়নার ব্যবস্থা আবশ্যক যাহাতে পাতার প্রাণনাশ না হয় এবং নাড়ার মাত্রাটা যেন ঠিক এক পরিমাণে থাকে।

গাছটিকে কোনো সহজ উপায়ে নিদ্রিত অথবা নিশ্চল অবস্থা হইতে জাগাইতে হইবে। রাজকন্যা মায়াবশে নিদ্রিতা ছিলেন; সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির স্পর্শে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সম্মুখের পরীক্ষা হইতে জানা যাইতেছে যে, সোনার কাঠি ও

রূপার কাঠি স্পর্শ করা মাত্র লজ্জাবতী লতা ও নিশ্চল ব্যাঙ পাতা ও গা নাড়িয়া সাড়া দিল। ইহার কারণ এই যে, দুই বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শ হইলেই বিদ্যুৎস্রোত বহিতে থাকে এবং সেই বিদ্যুৎবলে সর্বপ্রকার জীব ও উদ্ভিদ একইরূপে উত্তেজিত হয়। বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা উত্তেজিত করিবার সুবিধা এই যে, কল দ্বারা উহার শক্তি হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়, অথবা একই প্রকার রাখা যাইতে পারে। ইচ্ছাক্রমে বিদ্যুতের আঘাত বজ্রানুরূপ ভীষণ করিয়া মুহূর্তে জীবন ধ্বংস করা যাইতে পারে, অথবা কলের কাঁটা ঘুরাইয়া আঘাত মৃদু হইতে মৃদুতর করা যায়। এইরূপ মৃদু আঘাতে বৃক্ষের কোনো অনিষ্ট হয় না।

গাছের লিপিযন্ত্র

গাছের সাড়া দিবার কথা বলিয়াছি। এখন কঠিন সমস্যা এই যে, কি করিয়া গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। জন্তুর সাড়া সাধারণতঃ কলম সংযোগে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু চড়ুই পাখির লেজে কুলা বাঁধিলে তাহার উড়িবার যেরূপ সাহায্য হয়, গাছের পাতার সহিত কলম বাঁধিলে তাহার লিখিবার সাহায্যও সেইরূপই হইয়া থাকে। এমন-কি, বন-চাঁড়ালের ক্ষুদ্র পত্র সুতার ভার পর্যন্তও সহিতে পারে না; সুতরাং সে যে কলম ঠেলিয়া সাড়া লিখিবে এরূপ কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এ জন্য আমি অন্য উপায় গ্রহণ

করিয়াছিলাম। আলো-রেখার কোনো ওজন নাই। প্রথমতঃ, প্রতিবিম্বিত আলো-রেখার সাহায্যে আমি বৃক্ষপত্রের বিবিধ লিপিভঙ্গী স্বহস্তে লিখিয়া লইয়াছিলাম। ইহা সম্পাদন করিতেও বহু বৎসর লাগিয়াছিল। যখন এই সকল নূতন কথা জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিকট উপস্থিত করিলাম তখন তাঁহারা যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। পরিশেষে আমাকে জানাইলেন যে, এই সকল তত্ত্ব এরূপ অভাবনীয় যে, যদি কোনোদিন বৃক্ষ স্বহস্তে লিখিয়া সাক্ষ্য দেয়, কেবল তাহা হইলেই তাঁহারা এরূপ নূতন কথা মানিয়া লইবেন।

যেদিন এ সংবাদ আসিল সেদিন সকল আলো যেন আমার চক্ষে নিবিয়া গেল। কিন্তু পূর্ব হইতেই জানিতাম—সফলতা বিফলতারই উল্টা পিঠ। এ কথাটা আবার নূতন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বারো বৎসর পর শাপই বর হইল। সেই বারো বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলিব। কলটি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িলাম। অতি সূক্ষ্ম তার দিয়া একান্ত লঘু ওজনের কলম প্রস্তুত করিলাম। সে কলমটিও মরকত-নির্মিত জুয়েলের উপর স্থাপিত হইল, যেন পাতার একটু টানেই লেখনী সহজে ঘুরিতে পারে। এতদিন পরে বৃক্ষপত্রের স্পন্দনের সহিত লেখনী স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাহার পর লিখিবার কাগজের ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কলম আর উঠিতে পারিল না। কাগজ ছাড়িয়া মসৃণ কাচের উপর প্রদীপের কৃষ্ণ কাজল

লেপিলাম। কৃষ্ণ লিপিপটে শুভ্র লেখা হইল। ইহাতে ঘর্ষণের বাধাও অনেকটা কমিয়া গেল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গাছের পাতা সেই সামান্য ঘর্ষণের বাধা ঠেলিয়া কলম চালাইতে পারিল না। ইহার পর অসম্ভবকে সম্ভব করিতে আরও ৫।৬ বৎসর লাগিল। তাহা আমার 'সমতাল' যন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে। এই সকল কলের গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই সকল কলের দ্বারা বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হয়। বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে নির্ণীত হয় এবং এইরূপে তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হয় এবং জীবন ও মৃত্যু -রেখা তাহার আয়ু পরিমাণ করে।

গাছের লেখা হইতে তাহার ভিতরকার ইতিহাস উদ্ধার

গাছের লিখনভঙ্গী ব্যাখ্যা অনেক সময়-সাপেক্ষ। তবে উত্তেজিত অবস্থায় সাড়া বড়ো হয়, বিমর্ষ অবস্থায় সাড়া ছোটো হয় এবং মুমূর্ষু অবস্থায় সাড়া লুপ্তপ্রায় হয়। এই যে সাড়ালিপি সম্মুখে দেখিতেছেন তাহা লিখিবার সময় আকাশ ভরিয়া পূর্ণ আলো এবং বৃক্ষ উৎফুল্ল অবস্থায় ছিল। সেইজন্য সাড়াগুলির পরিমাণ কেমন বৃহৎ! দেখিতে দেখিতে সাড়ার মাত্রা কোনো অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ ছোটো হইয়া গেল। ইতিমধ্যে যদি কোনো

পরিবর্তন হইয়া থাকে তাহা আমার অনুভূতিরও অগোচর ছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সূর্যের সম্মুখে একখানা ক্ষুদ্র মেঘ-খণ্ড বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে। তাহার জন্য সূর্যালোকের যে যৎকিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল তাহা ঘরের ভিতর হইতে কোনোরূপে বুঝিতে পারি নাই ; কিন্তু গাছ টের পাইয়াছিল, সে ছোট্ট সাড়া দিয়া তাহার বিমর্ষতা জ্ঞাপন করিল। আর যেই মেঘখণ্ড চলিয়া গেল অমনি তাহার পূর্বের ন্যায় উৎফুল্লতার সাড়া প্রদান করিল। পূর্বে বলিয়াছি যে, আমি বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, সকল গাছেরই অনুভব-শক্তি আছে। এ কথা পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিয়দ্দিন হইল ফরিদপুরের খেজুর বৃক্ষ আমার কথা প্রমাণ করিয়াছে। এই গাছটি প্রত্যুষে মস্তক উত্তোলন করিত, আর সন্ধ্যার সময় মস্তক অবনত করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিত। ইহা যে গাছের বাহিরের পরিবর্তনের অনুভূতিজনিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যে সকল উদাহরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, বৃক্ষ-লিখিত সাড়া দ্বারা তাহার জীবনের গুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হইতে পারে। গাছের পরীক্ষা হইতে জীবন সম্বন্ধে এইরূপ বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যতীত অনেক দার্শনিক প্রশ্নেরও মীমাংসা হইবে বলিয়া মনে হয়।

পাত্রাধার তৈল

শুনিতে পাই, কুকুরের লাঙুল আন্দোলন লইয়া দুই মতের এ পর্যন্ত মীমাংসা হয় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কুকুর লেজ নাড়ে ; অন্য পক্ষে বলিয়া থাকেন, লেজই কুকুরকে নাড়িয়া থাকে। এইরূপ পাতা নড়ে, কি গাছ নড়ে ? তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল ? কে নাড়ায় আর কে সাড়া দেয় ? বিলাতে আমাদের সমাজ লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়া থাকে। এ দেশে নাকি নারীজাতি নিজের ইচ্ছায় কিছু করিতে পারেন না, কেবল পুরুষের ইঙ্গিতে পুতুলের ন্যায় তাঁহারা চলাফেরা করিয়া থাকেন। কে কাহার ইঙ্গিতে চলে ? রাশ কাহার হাতে ? কে নাড়ায়, কুকুর কিংবা তাহার লেজ ? ভুক্তভোগীরা যাহা যাহা বলেন তাহা অন্যরূপ। বাহিরে যতই প্রতাপ, যতই আস্ফালন, এ সকল পুতুলের নাচমাত্র, চালাইবার সূত্র নাকি অন্তঃপুরে। এমন সময়ও আসে যখন রমণী সেই বন্ধন-রজ্জু স্বীয় হস্তেই ছেদন করেন। অঞ্চল দিয়া যাহাকে এতদিন রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাকেই আদেশ করেন—যাও তুমি দূরে, কেবল আশীর্বাদ লইয়া! তোমাকে মৃত্যুর হস্তেই বরণ করিলাম!

আঘাত করিলে লজ্জাবতীর পাতা পড়িয়া যায়। পাতা নড়ে কিংবা গাছ নড়ে, তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রথম, গাছ ধরিয়া রাখিলে গাছ নড়িতে পারে না,

পাতাই নড়ে। কিন্তু যদি পাতা ধরিয়া মাটি হইতে মূল উঠাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যায়— আঘাতে গাছই নড়িয়া উঠে, পাতা স্থির থাকে। অঙ্গে আঘাত পাইলে সেই আঘাতের বেদনা সমস্ত শিরায় শিরায় বৃক্ষের সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ধাবিত হয় এবং একের আপদ অন্যে নিজের বলিয়া লয়। কারণ, যদিও বৃক্ষটি শত সহস্র শাখাপ্রশাখা লইয়া গঠিত, তাহা সত্ত্বেও কোনো গ্রন্থি ইহাদিগকে এক করিয়া বাঁধিয়াছে। কেবল সেই একতার বন্ধনের জন্যই বাহিরের ঝটিকা ও আঘাত তুচ্ছ করিয়া বৃক্ষ তাহার শির উন্নত করিয়া রহিয়াছে।

আহতের সাড়া

এক্ষণে দেখা যাউক, কি কি বিভিন্নরূপে আহত বৃক্ষ তাহার ক্লিষ্টতা বাহিরে জ্ঞাপন করে। আমি এ সম্বন্ধে বৃক্ষের দুই প্রকার সাড়া বিবৃত করিব। প্রথমতঃ, বর্ধনশীল গাছে ছুরি বসাইলে বৃদ্ধির মাত্রা বাড়ে কি কমে, সে বিষয় জ্ঞাপন করিব। দ্বিতীয়তঃ, গাছের পাতা কাটিয়া ফেলিলে সেই অস্ত্রাঘাতে গাছ এবং বৃক্ষবিচ্যুত পাতা কিরূপ অনুভব করিবে তাহা দেখাইব।

গাছ স্বভাবতঃ কতখানি করিয়া বাড়ে তাহা জানিতে হইলে অনেক সময় লাগে। শম্বুকের গতি হইতেও গাছের বৃদ্ধিগতি ছয় সহস্র গুণ ক্ষীণ; এজন্য আমাকে এক নূতন কল আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, তাহার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ। তাহা দ্বারা বৃদ্ধি-

মাত্রা কোটি গুণ বাড়াইয়া লিপিবদ্ধ হয়। যেখানে অণুবীক্ষণ পরাস্ত, তাহার পরও ক্রেস্কোগ্রাফের কৃতিত্ব লক্ষগুণ বেশি। কোটি গুণ বৃদ্ধি আপনারা মনে ধারণা করিতে পারিবেন না ; এজন্য গল্পচ্ছলে উদাহরণ দিতেছি। একবার বাংলা-নাগপুর এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের গাড়ির দৌড় হইয়াছিল— কে আগে যাইতে পারে। এমন সময় এক শম্বুক তাহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। অমনি সে ক্রেস্কোগ্রাফের উপর আরোহণ করিল। খানিক পরে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, গাড়ি বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইচ্ছা ছিল কলের নাম ক্রেস্কোগ্রাফ না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখি। কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম আমার নূতন কলগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম ; যেমন 'কুঞ্চনমান' এবং 'শোষণমান'। স্বদেশী প্রচার করিতে যাইয়া অতিশয় বিপন্ন হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই সকল নাম কিম্ভূত-কিমাকার হইয়াছে বলিয়া বিলাতি কাগজ উপহাস করিলেন। কেবল বোস্টনের প্রধান পত্রিকা অনেকদিন আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সম্পাদক লেখেন, 'যে আবিষ্কার করে, তাহারই নামকরণের প্রথম অধিকার। তাহার পর নূতন কলের নাম পুরাতন ভাষা লাটিন ও গ্রীক হইতেই হইয়া থাকে। তাহা যদি হয় তবে অতি পুরাতন অথচ জীবন্ত সংস্কৃত হইতে কেন হইবে না ?' বলপূর্বক যেন নাম চালাইলাম, কিন্তু ফল হইল

অন্যরূপ। গতবারে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার কল 'কাঞ্চনম্যান' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, শেষে বুঝিলাম 'কুঞ্চনমান' 'কাঞ্চনম্যানে' রূপান্তরিত হইয়াছে। হান্টার সাহেবের প্রণালী মতে কুঞ্চন বানান করিয়াছিলাম, হইয়া উঠিল কাঞ্চন। রোমক অক্ষরমালার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার কোনো-একটা স্বরকে অ হইতে ঐ পর্যন্ত যথেচ্ছরূপে উচ্চারণ করা হইতে পারে; কেবল হয় না, ঋ ও ঌ। তাহাও উপরে কিংবা নীচে দুই-একটা ফোঁটা দিলে হইতে পারে।

সে যাহা হউক, বুঝিতে পারিলাম— হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করানো যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাংলা কিংবা সংস্কৃত বলানো একেবারেই অসম্ভব। এজন্যই আমাদের হরিকে হ্যারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের 'বৃদ্ধিমান' নামকরণের ইচ্ছা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধিমান— হইতে বার্‌ডোয়ান হইত। তার চেয়ে বরং ক্রেস্কোগ্রাফই ভালো।

বাড়ন্ত গাছ প্রতি সেকেণ্ডে কতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা পর্যন্ত এই কল লিখিয়া দেয়। ইহাতে জানা যায় যে, এই গাছটি এক মিনিটে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের ৪২ ভাগ করিয়া বাড়িতেছিল। গাছটিকে তখন একখানা বেত দিয়া সামান্য রকমে

আঘাত করিলাম। এমনি গাছের বৃদ্ধি একেবারে কমিয়া গেল। সে আঘাত ভুলিতে গাছের আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিয়াছিল। তাহার পর অতি সন্তর্পণে সে পুনরায় বাড়িতে আরম্ভ করিল। হে বেত্রপাণি স্কুলমাস্টার, তোমার কানমলা খাইয়া কেহ কেহ যে হাইকোর্টের জজ পর্যন্ত হইয়াছেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু ছেলেরা তোমার হাতে বেত খাইয়া যে হঠাৎ লম্বায় বাড়িয়া উঠিবে, এ সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে। সর্বপ্রকার আঘাতেই বৃদ্ধি কমিয়া যায়। সূঁচ দিয়া বিঁধিয়াছিলাম, তাহাতে গাছের বৃদ্ধি কমিয়া এক-চতুর্থ হইয়া গেল। এক ঘণ্টা পরেও সে আঘাত সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই, তখনও তাহার বৃদ্ধির গতি অর্ধেকেরও অধিক হইতে পারে নাই। ছুরি দিয়া লম্বাভাবে চিরিলে আঘাত আরও গুরুতর হয়। তাহাতে বৃদ্ধি অনেক সময় পর্যন্ত থামিয়া যায়। কিন্তু লম্বা চেরার চেয়ে এপাশ ওপাশ করিয়া কাটা আরও নিদারুণ। কই-মাছ কাটিবার সময় এই কথাটি যেন গৃহলক্ষ্মীরা মনে রাখেন।

আঘাতে অনুভূতি-শক্তির বিলোপ

ইহার পর লজ্জাবতী লতার পাতা কাটিলাম। তাহাতে কাটা পাতা এবং গাছের যে সকল পাতা ছিল সমস্তগুলিই মুষড়াইয়া পড়িয়া গেল। ইহার পর দেখিতে হইবে, কাটা পাতা ও আহত

বৃক্ষের অবস্থা কিরূপ হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, ৩।৪ ঘণ্টা পর্যন্ত উভয়েই একেবারে অচেতন। তাহার পরের ইতিহাস বড়োই অদ্ভুত। কাটা পাতাটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সুখাদ্য রস পান করিতে দিয়াছিলাম। ইহাতে পাতাটা চারি ঘণ্টার পর মাথা তুলিয়া উঠিল ও বড়ো রকমের সাড়া দিল। ভাবটা এই— কি হইয়াছে? ভালোই হইয়াছে; গাছটার সঙ্গে এতদিন বাঁধা ছিলাম, এখন শরীরটা কেমন লঘু লাগে! এই-রূপে পাতাটা জেদের সহিত বারংবার সাড়া দিতে লাগিল। এই ভাবটা সমস্ত দিন ছিল। তাহার পরদিন কি যে হইল জানি না, সাড়াটা একেবারে কমিয়া গেল। ৫০ ঘণ্টার পর পাতাটা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। তার পরেই মৃত্যু!

যাহার পাতা কাটা হইয়াছিল সেই গাছটার ইতিহাস অন্য-রূপ। সে ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিল। 'কুছ্‌পরোয়া নেই' ভাবটা তাহার একেবারেই ছিল না। যাহা আছে তাহা লইয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে। ধীরে ধীরে আহত বৃক্ষ তাহার বেদনা সামলাইয়া লইল। যে সাময়িক দুর্বলতা আসিয়াছিল তাহা ঝাড়িয়া ফেলিল এবং পূর্বের ন্যায় সাড়া দিতে সক্ষম হইল।

জন্মভূমি

কেন তবে এই বিভিন্নতা? কি কারণে ছিন্নশাখ-বৃক্ষ আহত ও মুমূর্ষু হইয়াও কিয়দ্দিন পর বাঁচিয়া উঠে, আর বিচ্যুত-পত্র

নানা ভোগে লালিত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয়? ইহার কারণ এই যে, বৃক্ষের মূল একটা নির্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে স্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংগঠিত হইতেছে। সেই ভূমিই তাহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোষক।

বৃক্ষের ভিতরেও আর একটি শক্তি নিহিত আছে যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাহিরে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে পূর্ণজীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত যুঝিয়াছে। যে পরিবর্তন আবশ্যক, সে তাহা গ্রহণ করিয়াছে ; যাহা অনাবশ্যক, জীর্ণপত্রের ন্যায় সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে বাহিরের বিভীষিকা সে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আরও একটি শক্তি তাহার চিরসম্বল রহিয়াছে। সে যে বটবৃক্ষের বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই স্মৃতির ছাপ তাহার প্রতি অঙ্গে রহিয়াছে। এই জন্য তাহার মূল ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, তাহার শির ঊর্ধ্বে আলোকের সন্ধানে উন্নত এবং শাখা-প্রশাখা ছায়াদানে চতুর্দিকে প্রসারিত। তবে কি কি শক্তিবলে সে আহত হইয়াও বাঁচিয়া থাকে? ধৈর্যে ও দৃঢ়তায় সে তাহার স্বস্থান দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, অনুভূতিতে সে ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া লয়, স্মৃতিতে বহু জীবনের সঞ্চিত শক্তি নিজস্ব করিয়া লয়। আর

যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্নে পালিত হয়, যে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।

স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ

বাহিরের সংবাদ ভিতরে কি করিয়া পৌঁছায়? আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয় চতুর্দিকে প্রসারিত। বিবিধ ধাক্কা অথবা আঘাত তাহাদের উপর পতিত হইতেছে এবং সংবাদ ভিতরে প্রেরিত হইতেছে। আকাশের ঢেউ দ্বারা আহত হইয়া চক্ষু যে বার্তা প্রেরণ করে তাহা আলো বলিয়া মনে করি। বায়ুর ঢেউ কর্ণে আঘাত করিয়া যে সংবাদ প্রেরণ করে তাহা শব্দ বলিয়া উপলব্ধি হয়। বাহিরের আঘাতের মাত্রা মৃদু হইলে সচরাচর তাহা সুখকর বলিয়াই মনে করি। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্যরূপ অনুভূতি হইয়া থাকে। মৃদুস্পর্শ সুখকর, কিন্তু ইষ্টকাঘাত কোনোরূপেই সুখজনক নহে।

টেলিগ্রাফের তার দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ স্থান হইতে স্থানান্তরে পৌঁছিয়া থাকে এবং এইরূপে দূরদেশে সংকেত প্রেরিত হয়। তার কাটিয়া দিলে সংবাদ বন্ধ হয়। একই বিদ্যুৎ-প্রবাহ বিভিন্ন কলে বিবিধ সংকেত করিয়া থাকে— কাঁটা নাড়ায়, ঘণ্টা বাজায় অথবা আলো জ্বালায়। বিবিধ ইন্দ্রিয় স্নায়ুসূত্র দিয়া যে উত্তেজনা-প্রবাহ প্রেরণ করে তাহা কখনও শব্দ, কখনও আলো এবং কখনও বা স্পর্শ বলিয়া অনুভব করি। উত্তেজনা-প্রবাহ যদি মাংসপেশীতে পতিত হয় তখন পেশী সংকুচিত হয়। তার কাটিলে যেরূপ খবর বন্ধ হয়, স্নায়ুসূত্র কাটিলে সেইরূপ বাহিরের সংবাদ আর ভিতরে পৌঁছায় না।

স্বতঃস্পন্দন ও ভিতরের শক্তি

বাহিরের আঘাতজনিত সাড়ার কথা বলিয়াছি। তাহা ছাড়া আর এক রকমের সাড়া আছে যাহা আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। সেই স্বতঃস্পন্দন ভিতরের কোনো অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা ঘটিয়া থাকে। আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন ইহারই একটি উদাহরণ। ইহা আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্-জগতে ইহার উদাহরণ দেখা যায়। বনচাঁড়ালের ছোটো তুইটি পাতা আপনা-আপনিই নড়িতে থাকে। ভিতরের শক্তিজাত স্বতঃস্পন্দনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা বাহিরের শক্তি দ্বারা বিচলিত হয় না ; বাহিরের শক্তিকে বরং প্রতিরোধ করে। সুতরাং দেখা যায়, তুই প্রকারের শক্তি দ্বারা জীব উত্তেজিত হয়— বাহিরের শক্তি এবং ভিতরের শক্তি। সচরাচর ভিতরের শক্তি বাহিরের শক্তিকে প্রতিরোধ করে।

ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য কিরূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে ?

আঘাতের মাত্রা অনুসারেই উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিতেছে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়েরও অগ্রাহ্য। আলো যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয় তখন দৃশ্য অদৃশ্যে মিলিয়া যায়। তখনও চক্ষু আলোক দ্বারা আহত হইতেছে সত্য, কিন্তু অতি ক্ষীণ উত্তেজনা-প্রবাহ স্নায়ুসূত্র দিয়া অধিক দূর যাইতে না পারিয়া নিদ্রিত অনুভূতি-শক্তিকে জাগাইতে

পারে না। ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য কি কোনোদিন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে? ক্ষণিকের জন্য একদিন যাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম তাহা তো আর দেখিতে পাইতেছি না! কি করিয়া তবে দৃষ্টি প্রখর হইবে, অনুভূতিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে?

অন্য দিকে বাহিরের ভীষণ আঘাতে অনুভূতি-শক্তি বেদনায় মুহ্যমান, সেই যন্ত্রণাদায়ক প্রবাহ কিরূপে প্রশমিত হইবে? হে ভীরু, যদিও তুমি একদিন মরিবে তথাপি অকাল-শঙ্কা-হেতু শত শত বার মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছ। যদিও বহির্জগতের আঘাত তুমি নিবারণ করিতে অসমর্থ, তথাপি অন্তর্জগতের তুমিই একমাত্র অধিপতি। যে পথ দিয়া বাহিরের সংবাদ তোমার নিকট পৌঁছিয়া থাকে, কোনোদিন কি সেই পথ তোমার আজ্ঞায় এক সময়ে প্রসারিত এবং অন্য সময়ে একেবারে রুদ্ধ হইবে?

কখনও কখনও উক্তরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে। মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যাহা দেখি নাই কিংবা শুনি নাই, চিত্তসংযম করিয়া তাহা দেখিয়াছি অথবা শুনিয়াছি। ইহাতে মনে হয়, ইচ্ছানুক্রমে এবং বহুদিনের অভ্যাসবলে অনুভূতি-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যখন স্নায়ুসূত্র দিয়াই বাহিরের খবর ভিতরে পৌঁছায় তখন স্নায়ুসূত্রের কি পরিবর্তনে অর্ধ-উন্মুক্ত দ্বার একেবারে খুলিয়া যায়? অন্য উপায়ও হয়তো আছে, যাহাতে খোলা দ্বার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

বাহিরের শক্তির প্রতিরোধ

এরূপ একটি ঘটনা কুমায়ুন-অবস্থানকালে দেখিয়াছিলাম। তরাই হইতে এক ভীষণ ব্যাঘ্র আসিয়া দেশ বিধ্বস্ত করিতেছিল। অল্প দিনেই শতাধিক লোক ব্যাঘ্র-কবলিত হইল। সরকার হইতে বাঘ মারিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। গ্রামবাসীরা তখন নিরুপায় হইয়া কালু সিংহের শরণাপন্ন হইল। সে কোনো কালে শিকার করিত, কিন্তু অস্ত্র-আইনের নিষেধহেতু বহুকাল যাবৎ তাহার পুরাতন এক-নলা বন্দুক ব্যবহার করে নাই। বাঘ দিনের বেলায় মাঠে মহিষ বধ করিয়াছিল; সেই মহিষের আর্তনাদ স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিলাম। রাত্রে সে স্থানে বাঘ ফিরিয়া আসিবে, এই আশায় নিকটের ঝোপের আড়ালে কালু সিং প্রতীক্ষা করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় সাক্ষাৎ যমস্বরূপ বাঘ দেখা দিল; মাঝখানে ৩ হাত মাত্র ব্যবধান। ভয়ে কালু সিংহের সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল, কোনোরূপেই বন্দুক স্থির করিয়া লক্ষ্য করিতে পারিতেছিল না। কালু সিংহের নিকট পরে শুনিলাম— 'তখন আমি নিজকে ধমক দিয়া বলিলাম; একি, কালু সিং? স্ত্রী, বহিন, বাল-বাচ্চাদের জান বাঁচাইবার জন্য তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে, আর তুমি ঝোপের আড়ালে শুইয়া আছ? অমনি ভিতর দিয়া আগুনের মতো কি একটা ছুটিয়া গেল; তাহাতে শরীর লোহার মতো শক্ত হইল। তখন বাঘের

সামনে দাঁড়াইলাম। বাঘ আমাকে লক্ষ্য করিয়া লাফ দিল সেই সঙ্গেই আমার বন্দুকের আওয়াজ হইল, আর বাঘ মরিল।'

স্নায়ুর ভিতর দিয়া কি-একটা ছুটিয়া যায়, যাহাতে শরীর লোহার মতন কঠিন হয়। তখন সেই লৌহ-বর্ম ভেদ করিয়া বাহিরের কোনো ভয় ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। স্নায়ুসূত্রে কি পরিবর্তন ঘটে যাহা দ্বারা এরূপ অসম্ভবও সম্ভব হয়? স্নায়ুর ভিতরে উত্তেজনা-প্রবাহ সম্পূর্ণ অদৃশ্য; তাহার প্রকৃতি কি, তাহা কি নিয়মে চালিত হয়, তাহার কিছুই জানা নাই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা এই তথ্য নির্ণীত হইবে মনে করিয়া বিশ বৎসর যাবৎ এই সন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম।

বৃক্ষে স্নায়ুসূত্র

সর্বাগ্রে উদ্ভিদ-জীবন লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ফেফার, হ্যাবারল্যাণ্ড প্রমুখ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, প্রাণীদের ন্যায় উদ্ভিদে কোনো স্নায়ুসূত্র নাই; তবে লজ্জাবতী লতার একস্থানে চিমটি কাটিলে দূরস্থিত পাতা কেন পড়িয়া যায়? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন, চিমটি কাটিলে উদ্ভিদে জল-প্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং সেই প্রবাহের ধাক্কায় পাতা পতিত হইয়া থাকে। এই নিষ্পত্তি যে ভ্রমাত্মক তাহা আমার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, চিমটি না কাটিয়া অন্যরূপে লজ্জাবতী লতার উত্তেজনা-প্রবাহ প্রেরণ করা যাইতে

পারে, যে সব উপায়ে জল-প্রবাহ একেবারেই উৎপন্ন হয় না। আরও দেখা যায়, প্রাণীর স্নায়ুতে যে সব বিশেষত্ব আছে উদ্ভিদ-স্নায়ুতেও তাহা বর্তমান। নলের ভিতরে জল-প্রবাহের বেগ শীত কিংবা উষ্ণতায় হ্রাস-বৃদ্ধি পায় না ; কিন্তু স্নায়ুর উত্তেজনার বেগ ৯ ডিগ্রি উত্তাপে দ্বিগুণিত হয়। উদ্ভিদে তাহাই হইয়া থাকে। অধিক শৈত্যে উদ্ভিদের স্নায়ুসূত্র অসাড় হইয়া যায় ; তখন উত্তেজনা-প্রবাহ একেবারেই বন্ধ হয়। ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে উত্তেজনা-প্রবাহ স্থগিত হইয়া যায়। উদ্ভিদে যে স্নায়ুসূত্র আছে— আমার এই সিদ্ধান্ত এখন সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে।

আণবিক সন্নিবেশে উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি

প্রথমে দেখা যাউক, কি উপায়ে স্নায়ুর উত্তেজনা দূরে প্রেরিত হয়। এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হইলে পরে দেখা যাইবে, কিরূপে উত্তেজনা-প্রবাহ বর্ধিত কিংবা প্রশমিত হইতে পারে। স্নায়ুসূত্র অসংখ্য অণু-গঠিত ; প্রত্যেক অণুই স্বাভাবিক অবস্থায় আপেক্ষিক নিশ্চলভাবে স্বীয় স্থানে অবস্থিত। কিন্তু আঘাত পাইলে হেলিতে দুলিতে থাকে ; এই হেলা-দোলাই উত্তেজিত অবস্থা। একটি অণু যখন স্পন্দিত হয়, পার্শ্বের অন্য অণুও প্রথম অণুর আঘাতে স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং এইরূপ ধারা-বাহিক রূপে স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা এক প্রান্ত হইতে অন্য

প্রান্তে প্রেরিত হয়। অণুর আঘাতজনিত কম্পন কিরূপে দূরে প্রেরিত হয় তাহার একটা ছবি কল্পনা করিতে পারি। মনে কর, টেবিলের উপর এক সারি পুস্তক সোজাভাবে সাজানো আছে। ডান দিকের বইখানাকে বাম দিকে ধাক্কা দিলে প্রথম নম্বরের পুস্তক দ্বিতীয় নম্বরের পুস্তকের উপর পড়িয়া তৃতীয় পুস্তককে ধাক্কা দিবে এবং এইরূপে আঘাতের ধাক্কা এক দিক হইতে অন্য দিকে পৌঁছিবে।

বইগুলি প্রথমে সোজা ছিল এবং প্রথম পুস্তকখানাকে উল্টাইয়া ফেলিতে কিয়ৎপরিমাণ শক্তির আবশ্যক ; মনে কর তাহার মাত্রা পাঁচ। ধাক্কার জোর যদি পাঁচ না হইয়া তিন হয় তাহা হইলে বইখানা উল্টাইয়া পড়িবে না ; সুতরাং পার্শ্বের বইগুলিও নিশ্চল অবস্থায় থাকিবে। এই কারণে বহিরিন্দ্রিয়ের উপর ধাক্কা যখন অতি ক্ষীণ হয় তখন উত্তেজনা দূরে পৌঁছিতে পারে না এবং এই জন্য বাহিরের আঘাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। মনে কর, বইগুলিকে সোজা অবস্থায় না রাখিয়া বাম দিকে একটু হেলানো অবস্থায় রাখা গেল। এবার স্বল্প ধাক্কাতেই বইখানা উল্টাইয়া পড়িবে এবং ধাক্কাটা এক দিক হইতে অন্য দিকে পৌঁছিবে। পূর্বে ধাক্কার জোর পাঁচ না হইয়া তিন হইলে আঘাত দূরে পৌঁছিত না, এখন তাহা সহজেই পৌঁছিবে। বইগুলিকে উল্টাদিকে হেলাইলে পাঁচ নম্বরের ধাক্কা প্রথম পুস্তকখানাকে উল্টাইতে পারিবে না। ধাক্কা এবার দূরে

পৌঁছিবে না ; গন্তব্য পথ যেন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। এই উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, স্নায়ুসূত্রের অণুগুলিকেও দুই প্রকারে সাজানো যাইতে পারে। 'সমুখ' সন্নিবেশে ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য শক্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে। আর 'বিমুখ' সন্নিবেশে বাহিরের ভীষণ আঘাতজনিত উত্তেজনার ধাক্কা ভিতরে পৌঁছিতে পারে না।

পরীক্ষা

উত্তেজনা-প্রবাহ সংযত করিবার সমস্যা কিরূপে পূরণ করিতে সমর্থ হইব তাহা স্থূলভাবে বর্ণনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে যাহা মনে করিয়াছি তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। তবে কি উপায়ে আণবিক সন্নিবেশ 'সমুখ' অথবা 'বিমুখ' হইতে পারে? এরূপ দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ-প্রবাহ এক দিকে প্রেরণ করিলে নিকটের চুম্বক-শলাকাগুলি ঘুরিয়া একমুখী হইয়া যায়; বিদ্যুৎ-প্রবাহ অন্য দিকে প্রেরণ করিলে শলাকাগুলি ঘুরিয়া অন্যমুখী হয়। বিদ্যুৎ-বাহক জলীয় পদার্থের ভিতর দিয়া যদি বিদ্যুৎ-স্রোত প্রেরণ করা যায় তবে অণুগুলিও বিচলিত হইয়া যায় এবং অণু-সন্নিবেশ বিদ্যুৎ-স্রোতের দিক অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে।

স্নায়ুসূত্রে এই উপায়ে দুই প্রকারে আণবিক সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। প্রথম পরীক্ষা লজ্জাবতী লইয়া করিয়াছিলাম। আঘাতের মাত্রা এরূপ ক্ষীণ করিলাম যে, লজ্জাবতী তাহা

অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। তাহার পর আণবিক সন্নিবেশ 'সমুখ' করা হইল। অমনি যে আঘাত লজ্জাবতী কোনোদিনও টের পায় নাই এখন তাহা অনুভব করিল এবং সজোরে পাতা নাড়িয়া সাড়া দিল। ইহার পর আণবিক সন্নিবেশ 'বিমুখ' করিলাম। এবার লজ্জাবতীর উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেও লজ্জাবতী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না ; পাতাগুলি নিস্পন্দিত থাকিয়া উপেক্ষা জানাইল।

তাহার পর ভেক ধরিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষা করিলাম। যে আঘাত ভেক কোনোদিনও অনুভব করে নাই স্নায়ুসূত্রে 'সমুখ' আণবিক সন্নিবেশে সে তাহা অনুভব করিল এবং গা নাড়িয়া সাড়া দিল। তাহার পর 'কাটা ঘায়ে নুন' প্রয়োগ করিলাম। এবার ব্যাঙ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু যেমনই আণবিক সন্নিবেশ 'বিমুখ' করিলাম অমনি বেদনাজনক প্রবাহ যেন পথের মাঝখানে আবদ্ধ হইয়া রহিল এবং ব্যাঙ একেবারে শান্ত হইল।

সুতরাং দেখা যায় যে, স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ ইচ্ছানুসারে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই হ্রাস-বৃদ্ধি আণবিক সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে। একরূপ সন্নিবেশে উত্তেজনার প্রবাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, অন্যরূপ সন্নিবেশে উত্তেজনার প্রবাহ আড়ষ্ট হইয়া যায়। আরও দেখা যায়, এই আণবিক সন্নিবেশ এবং তজ্জনিত উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি বাহিরের নির্দিষ্ট

শক্তি প্রয়োগে নিয়মিত করা যাইতে পারে। ইহা কোনো আকস্মিক কিংবা দৈবঘটনা নহে, কিন্তু পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহাতে কার্য-কারণের সম্বন্ধ অকাট্য।

বাহিরের শক্তি দ্বারা যাহা ঘটিয়া থাকে ভিতরের শক্তি দ্বারাও অনেক সময়ে তাহা সংঘটিত হয়। বাহিরের আঘাতে হস্ত-পেশী যেরূপ সংকুচিত হয়, ভিতরের ইচ্ছায়ও হস্ত সেইরূপ সংকুচিত হয়। উল্টা রকমের হুকুমে হাত শ্লথ হইয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় যে, স্নায়ুসূত্রে আণবিক সন্নিবেশ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে। তাহা হইলে ভিতরের শক্তিবলেও স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ বর্ধিত অথবা সংযত হইতে পারিবে। তবে এই দুই প্রকার আণবিক সন্নিবেশ করিবার ক্ষমতা বহু দিনের অভ্যাস ও সাধনা -সাপেক্ষ। শিশু প্রথম প্রথম হাঁটিতে পারে না ; কিন্তু অনেক দিনের চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে চলাফেরা স্বাভাবিক হইয়া যায়।

সুতরাং মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে, তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে যাহার দ্বারা সে বহির্জগৎ-নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির ও ভিতরের প্রবেশ-দ্বার কখনও উদ্‌ঘাটিত, কখনও অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এইরূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার উপর সে জয়ী হইবে। যে ক্ষীণ বার্তা শুনিতে পায় নাই তাহা শ্রুতিগোচর হইবে, যে লক্ষ্য সে দেখিতে পায় নাই তাহা তাহার নিকট জাজ্বল্যমান হইবে।

অন্যপ্রকারে সে বাহিরের সর্ব বিভীষিকার অতীত হইবে। অন্তররাজ্যে স্বেচ্ছাবলে সে বাহিরের ঝঞ্ঝার মধ্যেও অক্ষুব্ধ রহিবে।

ভিতর ও বাহির

ভিতরের শক্তি তো স্বেচ্ছা! তবে জীবনের কোন্ স্তরে এই শক্তির উদ্ভব হইয়াছে? শুষ্ক তৃণ জল-স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু জীব কেবল বাহিরের প্রবাহ দ্বারাই পরিচালিত হয় না, বরং ঢেউয়ের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণ করে। কোন্ স্তরে তবে এই যুঝিবার শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব-বিন্দু কখনও বাহিরের শক্তি গ্রহণ করে, কখনও ভিতরের শক্তি দিয়া প্রতিহার করে। গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতাই তো ইচ্ছা-শক্তি।

আর ভিতরের শক্তিই বা কিরূপে উদ্ভূত হইয়াছে? বাহিরের ও ভিতরের শক্তি কিং একেবারেই বিভিন্ন? পূর্বে বলিয়াছি যে, বনচাঁড়ালের পাতা দুইটি ভিতরের শক্তিবলে আপনা-আপনিই নড়িতে থাকে। কিন্তু গাছটিকে দুই দিন অন্ধকারে রাখিয়া দেখিলাম যে, পাতা দুইটি একেবারেই নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ভিতরের শক্তি যাহা সঞ্চিত ছিল তাহা এখন ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন পাতা দুইটির উপর ক্ষণিকের জন্য আলো নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, পাতা নড়িয়া সাড়া

দিতেছে ; কিন্তু আলো বন্ধ করিলেই পাতার স্পন্দন থামিয়া যায়। ইহার পর অধিক কাল আলোক নিক্ষেপ করিলে এক অত্যদ্ভুত ঘটনা দেখা যায়। এবার আলো বন্ধ করিবার পরেও পাতা দুইটি বহুক্ষণ ধরিয়া যেন স্বেচ্ছায় নড়িতে থাকে। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা আর কি হইতে পারে? দেখা যায়, আলোরূপে যাহা বাহিরের শক্তি ছিল, গাছ তাহা গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে এবং বাহির হইতে সঞ্চিত শক্তি এখন ভিতরের শক্তির রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং বাহিরের ও ভিতরের শক্তি প্রকৃতপক্ষে একই ; সামান্য বিভিন্নতা এই যে, যাহা পর্দার ও-পারে ছিল তাহা এ-পারে আসিয়াছে ; যাহা পর ছিল তাহা আপন হইয়াছে। আরও দেখা যায় যে, এইরূপ স্বতঃস্পন্দিত অবস্থায় পাতাটি বাহিরের আঘাতে বিচলিত হয় না। সে এখন বাহিরের শক্তি-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ ভিতরের শক্তি দিয়া বাহিরের শক্তি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যখন ভিতরের সঞ্চয় ফুরাইবে কেবল তখনই গ্রহণ করিবে এবং পরে স্বেচ্ছাক্রমে প্রত্যাখ্যান করিবে। জীবনের কোন্ স্তরে তবে ভিতরের শক্তি ও স্বেচ্ছা উদ্ভূত হইয়াছে?

জন্মিবার সময় ক্ষুদ্র ও অসহায় হইয়া এই শক্তিসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। তখন বাহিরের শক্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার শরীর লালিত ও বর্ধিত করিয়াছে। মাতৃস্তন্যের সহিত স্নেহ মায়া মমতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং

বন্ধুজনের প্রেমের দ্বারা জীবন উৎফুল্ল হইয়াছে। দুর্দিন ও বাহিরের আঘাতের ফলে ভিতরে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহারই বলে বাহিরের সহিত যুঝিতে সক্ষম হইয়াছি।

ইহার মধ্যে আমার নিজস্ব কোথায়? এই সবের মূলে আমি না তুমি?

একের জীবনের উচ্ছ্বাসে তুমি অন্য জীবন পূর্ণ করিয়াছ; অনেকে তোমারই নির্দেশে জ্ঞান-সন্ধানার্থে জীবনপাত করিয়াছে, মানবের কল্যাণহেতু রাজ্য-সম্পদ ত্যাগ করিয়া দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করিয়াছে এবং দেশসেবায় অকাতরে বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিয়াছে। সেই সব জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবন জ্ঞান ও ধর্মে, শৌর্য ও বীর্যে পরিপূরিত করিয়াছে।

ভিতর ও বাহিরের শক্তি-সংগ্রামেই জীবন বিবিধরূপে পরিস্ফুটিত হইতেছে। উভয়ের মূলে একই মহাশক্তি, যদ্দ্বারা অজীব ও সজীব, অণু ও ব্রহ্মাণ্ড অনুপ্রাণিত। সেই শক্তির উচ্ছ্বাসেই জীবনের অভিব্যক্তি। সেই শক্তিতেই মানব দানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইবে।

হঠাৎ চীৎকার করিয়া কেহ উত্তর দিল—'হাজির !' কাহাকেও ডাকিতে শুনি নাই, তথাপি অতি করুণ ও ভক্তি-উচ্ছ্বসিত স্বরে উত্তর শুনিলাম—'কি আজ্ঞা প্রভু ?' কে তোমার প্রভু, কাহার হুকুমে এরূপ উদ্দীপ্ত হইলে ?

কি আশ্চর্য ! একটি কথাতেই জীবনের সমস্ত স্তরগুলি আলোড়িত হইল। সুপ্তস্মৃতি আজ জাগরিত— যাহা অশব্দ, আজ তাহা শব্দায়মান ; যাহা বুদ্ধির অগম্য ছিল, আজ তাহা অর্থযুক্ত হইল।

এখন বুঝিতে পারিতেছি, বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে। মনে করিতাম, আমার ইচ্ছাতেই সব হইয়াছে। আমি কি এক ? একটু মন স্থির করিলেই দুই-এর মধ্যে যে সর্বদা কথা চলিতেছে তাহা শুনিতে পাই। ইহারাই আমাকে চালাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কুমতি তো আমি, সুমতি তবে কে ?

এ সম্বন্ধে ২৭ বৎসর পূর্বের কয়েকটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। কোনোদিনও লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারই আজ্ঞাতে 'আকাশ-স্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক' বিষয়ে লিখিলাম। পরে লিখাইল, 'উদ্ভিদ-জীবন মানবীয় জীবনেরই ছায়া মাত্র'। জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছুই জানিতাম না। কাহার আদেশে এরূপ লিখিলাম ?

লিখিয়াও নিষ্কৃতি পাইলাম না ; ভিতর হইতে কে সমালোচক সাজিয়া বলিতে লাগিল—'এত যে কথা রচনা করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি— ইহার কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা ?' জবাব দিলাম, 'যেসব বিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়াছেন, আমি সে সব কি করিয়া নির্ণয় করিব ? তাহাদের অসংখ্য কল-কারখানা ও পরীক্ষাগার আছে, এখানে তাহার কিছুই নাই ; অসম্ভবকে কি করিয়া সম্ভব করিব ?' ইহাতেও সমালোচকের কথা থামিল না। অগত্যা ছুতার কামার দিয়া তিন মাসের মধ্যে একটা কল প্রস্তুত করিলাম। তাহা দিয়া যেসব অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল তাহা আমার কথা দূরে থাকুক, বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগকে পর্যন্ত বিস্মিত করিল।

অল্পদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে অনেক সুখ্যাতি হইল এবং বিলাতের সংবর্ধনাসভায় নিমন্ত্রিত হইলাম। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম রাম্‌সে বহু সাধুবাদ করিলেন ; পরে বলিলেন, 'কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে, এখন হইতে ভারতে নূতন জ্ঞান-যুগ আরম্ভ হইল ; কিন্তু একটি কোকিলের ধ্বনিতে বসন্তের আগমন মনে করা যুক্তিসংগত নহে।' সেদিন বোধ হয় আমার উপর কুমতিরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিবে, কারণ স্পর্ধার সহিতই উত্তর দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, আপনাদের আশঙ্কা করিবার কোনো কারণ নাই, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, শীঘ্রই ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে শত কোকিল বসন্তের আবির্ভাব

ঘোষণা করিবে। এখন সেদিন আসিয়াছে; যাহা কুমতি বলিয়া ভয় করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহাই সুমতি। তখনকার শুভলগ্ন পাঁচ বৎসর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। একদিনের পর আর-একদিন অধিকতর উজ্জ্বল হইতে লাগিল এবং সম্মুখের সমস্ত পথগুলিই খুলিয়া গেল।

এমন সময় যে হুকুম আসিল তাহাতে সোজা পথ ছাড়িয়া দুর্গম অনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করিতে হইল। তখন তারহীন যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিতে পাইয়াছিলাম, কলের সাড়া প্রথম প্রথম বৃহৎ হইত, তাহার পর ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, দিবারম্ভেই পরীক্ষণ শ্রেয়ঃ; কারণ সারাদিন পরীক্ষার পর কল ক্লান্ত হইয়া যায়। অমনি ভিতরকার সমালোচক বলিয়া উঠিল— 'কল কি মানুষ, যে ক্লান্ত হইবে?'

কলে কেন ক্লান্তি হয়? এই প্রশ্ন কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না। অনেকগুলি আবিষ্কার কেবল লিখিবার অপেক্ষায় ছিল। সে সব ছাড়িয়া দিয়া নূতন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে হইল। ক্রমে দেখিতে পাইলাম, জীবনহীন ধাতুও উত্তেজিত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। উত্তেজনা স্থগিত রাখিলে স্বল্পাধিককালে ক্লান্তি দূর হয়। উদ্ভিদে এই সব প্রক্রিয়া অধিকতররূপে পরিস্ফুট দেখিলাম। এইরূপে বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

জীবতত্ত্ববিদের হস্তে এই সব নূতন তত্ত্ব রাখিয়া পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ফিরিয়া আসিব, মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। রয়্যাল সোসাইটিতে সব পরীক্ষা দেখাইয়াছিলাম। সর্বপ্রধান জীবতত্ত্ববিদ্ বার্ডন স্যাণ্ডারসন্ বলিলেন, 'জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যে পরীক্ষা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পূর্বে নিষ্ফল হইয়াছে ; সুতরাং আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য। এ শাস্ত্রে আপনার অনধিকারচর্চা হইয়াছে। আপনি পদার্থবিদ্যায় যশস্বী হইয়াছেন, আপনার সম্মুখে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব রহিয়াছে, আপনার অজ্ঞাত পথ হইতে নিবৃত্ত হউন।' তখন কুমতির প্ররোচনায় বলিলাম, নিবৃত্ত হইব না, এই বন্ধুর পথই আমার। আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িলাম। আজ যাহা প্রত্যাখ্যাত হইল তাহাই সত্য। ইচ্ছাতেই হউক অনিচ্ছাতেই হউক, তাহা সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

এই দুর্মতির ফল ফলিতে অধিক বিলম্ব হইল না। সব দিকের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল এবং সমস্ত আলো যেন অকস্মাৎ নিবিয়া গেল। কিন্তু ইহার পর হইতেই অন্তরের ক্ষীণ আলো অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল। প্রখর আলোকে যাহা দেখিতে পাই নাই, এখন তাহা দেখিতে পাইলাম। আশা ও নিরাশার অতীত এই ভাবে বিশ বৎসর কাটিল।

এক বৎসর পূর্বে হঠাৎ যেন নির্দেশ শুনিতে পাইলাম,

'বিদেশ যাও।' বিদেশযাত্রা! সেখানে কে আমার কথা শুনিবে? এবার কঠিন স্বর শুনিলাম, 'আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল! লাভালাভ বলিবার তুমি কে?' আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইলাম।

তার পর সমস্ত দিকের রুদ্ধ দ্বার একেবারে খুলিয়া গেল। কাহার হুকুমে এরূপ হইল? একি স্বপ্ন? বিরোধী যাঁহারা ছিলেন, এখন তাঁহারাই পরম মিত্র হইলেন। যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, এখন তাহা সর্বত্র গৃহীত হইল। বিশ বৎসর আগে যাহা কুমতি মনে করিয়াছিলাম, পুনরায় দেখিতে পাইলাম—তাহাই সুমতি।

সুতরাং কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা কুমতি জানি না। কোন্‌টা বড়ো আর কোন্‌টা ছোটো তাহাও মন বোঝে না। সুদিনের বৃহৎ সফলতা ভুলিয়া দুর্দিনের বিফলতার কথাই মনে পড়িতেছে। তখন সর্বত্রই পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম, কেবল দুই-এক জনের অহেতুক স্নেহ আমাকে আগলাইয়া রাখিয়াছিল। আজ তাহারা অন্ধকার যবনিকার পরপারে। অস্ফুট ক্রন্দন কি সেথায় পৌঁছিয়া থাকে?

জীবনের যখন পূর্ণশক্তি তখন কোলাহলের মধ্যে তোমার নির্দেশ স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পারিতাম না। এখন পারিতেছি: কিন্তু সব শক্তি নির্জীব হইয়া আসিতেছে। একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হইবে, মৃত্তিকা দিয়া যাহা

গড়িয়াছিলে তাহা ধূলি হইয়া পড়িয়া রহিবে। কি লইয়া তখন সে তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? অল্পই তাহার সুকৃতি, অসংখ্য তাহার দুষ্কৃতি। তবে বলিবার কি আছে? কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা দুর্মতি, এই ধন্ধাতেই জীবন কাটিয়াছে। সাফাই করিবার কথা যখন কিছুই নাই, তখন তোমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত সে কেবল বলিবে— 'আসামী হাজির!'

সংযোজন

মানুষের অঙ্গভঙ্গী হইতে তাহার ভিতরের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। সকালবেলা তাহার যে আকৃতি থাকে, দিনের শেষে সারাদিনের ক্লান্তিহেতু তাহা পরিবর্তিত হয়। সুখে সে উৎফুল্ল, দুঃখে সে বিবশ। সব জীবজন্তুর মূর্তি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে ; তাহা কেবল ভিতরের পরিবর্তনজনিত নহে। বাহিরের আঘাতেও তাহার অঙ্গভঙ্গী বিভিন্ন হইয়া যায়। তাড়নায় কুপিতা ফণিনী মুহূর্তেই সংহাররূপিণী হইয়া থাকে।

এইরূপে অহরহ ভিতর ও বাহিরের শক্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া জীব বহুরূপী হইয়াছে। ভিতরের শক্তির সহিত বাহিরের শক্তির নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাহিরের আঘাতের ফলেই ভিতরের শক্তি দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

এক সময়ে ভিতরে কিছুই ছিল না, বাহির হইতে শক্তি প্রবেশ করিয়া ভিতরে সংস্থিত হইয়াছে। যাহা বাহিরে অসীম ছিল, তাহাই ভিতরে সসীম হইল ; এবং সেই ক্ষুদ্র তখন বৃহতের সহিত যুঝিতে সমর্থ হয়। সেই ক্ষুদ্র কখনও বাহিরকে বরণ করে, কখনও বা প্রত্যাখ্যান করে। জীবনের এই লীলা বৈচিত্র্যময়ী।

জীবের ন্যায় বৃক্ষের ভঙ্গীও সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। পাতা কখনও আলোর সন্ধানে উন্মুখ হয়, কখনও প্রচণ্ড রৌদ্র-তাপ হইতে বিমুখ হয়। এই সকালবেলায় বাগানে বেড়াইতে

বেড়াইতে দেখিলাম যে, সূর্যমুখীর গাছটি পূর্বগগনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাতাগুলি ঘুরিয়া এরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক পাতার উপরে যেন সূর্যরশ্মি পূর্ণরূপে পতিত হয়। ইহার জন্য কোনো পাতা উপরের দিকে উঠিয়া থাকে, আর পাশের পাতাগুলি ডান কিংবা বাম দিকে পাক খাইয়া সূর্যকিরণ পূর্ণমাত্রায় আহরণ করে। বৈকালবেলায় দেখিতে পাইলাম, গাছ ও পাতা পশ্চিমগগনোন্মুখ হইয়াছে, ডাল এবং সব পাতাগুলি ঘুরিয়া গিয়াছে। কি শক্তির বলে এই পরিবর্তন ঘটিল ? বাহিরের সহিত ভিতরের এ কি অদ্ভুত সম্বন্ধ! সূর্য তো প্রায় পাঁচ কোটি ক্রোশ দূরে, তবে কি রাখীবন্ধনে গাছ দিবাকরের সহিত এইরূপ সম্মিলিত হইল ?

উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকে দেখা যায় যে, সূর্যমুখীর এই ব্যবহার 'হীলিওট্রোপিজ্‌ম্'-জনিত। হীলিওট্রোপিজ্‌মের বাংলা অনুবাদ, সূর্যের দিকে মুখ হওয়া। সূর্যমুখী কেন সূর্যের দিকে আকৃষ্ট হয় ? কারণ 'সূর্যের দিকে মুখ' হওয়াই তাহার প্রবৃত্তি! যখন কোনো বিষয়ের প্রকৃত সন্ধান না পাইয়া মানুষ উৎকণ্ঠিত হয়, তখন কোনো দুর্বোধ্য মন্ত্রতন্ত্র তাহাকে নিশ্চিন্ত করে। তবে সেই মন্ত্রটি সংস্কৃত, লাটিন, কিংবা গ্রীক ভাষায় হওয়া আবশ্যক। সোজা বাংলায় কিংবা অন্য আধুনিক ভাষায় হইলে মন্ত্রের শক্তি থাকে না। এই জন্যই গ্রীক হীলিওট্রোপিজ্‌ম্ মন্ত্রে সূর্যমুখীর ব্যবহার বিশদ হইল!

সে যাহাই হউক, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। এই সব অঙ্গভঙ্গী অদৃশ্য জীববিন্দুর প্রকৃতিগত কোনো পরিবর্তন দ্বারাই সাধিত হয়। জীববিন্দুর পরিবর্তন অণুবীক্ষণ-যন্ত্রেও অদৃশ্য। তবে কিরূপে সেই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করা যাইতে পারে? বহু চেষ্টার পর বিদ্যুৎ-বলে সেই অদৃশ্য জগৎকে দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই বিষয়ে দুই-একটি কথা পরে বলিব।

কেবল সূর্যমুখীই যে আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এরূপ নহে। টবে বসানো একটি লতা অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলাম। রুদ্ধ জানালার একটি রন্ধ্র দিয়া অতি ক্ষুদ্র আলোক-রেখা আসিতেছিল। পরের দিন দেখিলাম, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া সেই ক্ষীণ আলোকের দিকে প্রসারিত হইয়াছে।

লজ্জাবতী লতাতেও এইরূপ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। টবে বসানো লতাটি যদি জানালার নিকটে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া বাহিরের আলোর দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে। টব ঘুরাইয়া দিলে পাতাগুলি পুনরায় নূতন করিয়া ঘুরিয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাতাগুলি কেবল উঠে এবং নামে তাহা নয়, কোনোগুলি ডান দিকে এবং কোনোগুলি বাম দিকে পাক খায়। পাতার ডাঁটার গোড়ায় যে স্থূল পেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই পাতাগুলি ঘুরিয়া থাকে, কখনও উঠানামা করে, কখনও

ডান দিকে কিংবা বাম দিকে পাক খায়। পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে, পাতার গোড়ায় একটিমাত্র পেশী আছে যাহার দ্বারা কেবলমাত্র উঠানামা হয়। কিন্তু আমাদের হাত ঘুরাইতে হইলে অনেকগুলি পেশীর আকুঞ্চন এবং প্রসারণের আবশ্যক। অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, লজ্জাবতীর পাতার মূলে চারিটি বিভিন্ন পেশী আছে, যাহার অস্তিত্ব ইতিপূর্বে কেহই মনে করিতে পারেন নাই। একটি পেশীর দ্বারা পাতা উপরের দিকে উঠে, আর-একটির দ্বারা নীচের দিকে নামে, অন্য একটির দ্বারা ডান দিকে পাক খায় এবং চতুর্থ পেশীর দ্বারা বাম দিকে ঘুরিয়া যায়।

ইহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, পালক দ্বারা উপরের পেশীটুকুতে সুড়সুড়ি দিলে পাতাটি উপরের দিকে উঠে এবং সেই ঊর্ধ্ব গতি যন্ত্রের দ্বারা লিখিত হয়। এক নম্বরের বা চারি নম্বরের পেশীকে এইরূপে উত্তেজিত করিলে পাতাটি বাম দিকে বা ডান দিকে পাক খায়, দুই নম্বর বা তিন নম্বরটিকে ঐরূপ উত্তেজিত করিলে পাতা নীচে নামে বা উপরে উঠিয়া যায়। সূর্যের আলো এইরূপে পেশীর নানা অংশে নিক্ষেপ করিলে উক্তবিধ সাড়া পাওয়া যায়। তবে সূর্যের আলোক তো সব সময়ে পত্রমূলে পড়ে না, কারণ পাতার ছায়ায় পত্রমূলটি ঢাকা থাকে। লজ্জাবতীর বড়ো ডাঁটাটির সহিত চারিটি ছোটো ডাঁটা সংযুক্ত, এবং সেই ছোটো ডাঁটার গায়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা থাকে।

আলো সেই ক্ষুদ্র পাতার উপরই পড়ে। পড়িবামাত্রই দেখা যায় যে পাতা নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু পাতার নড়া-চড়া তো সেই দূরের স্থূল পেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণ ভিন্ন হইতে পারে না। তবে ছোটো পাতাগুলি আলোর অনুভবজনিত উত্তেজনায় কি সংকেত কোন্ পথ দিয়া দূরে পাঠাইয়া থাকে? এই বিষয়ে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, চারিটি ছোটো ডাঁটা হইতে পাতার মূল পর্যন্ত চারিটি বিভিন্ন স্নায়ুসূত্র প্রসারিত। তাহা দ্বারাই খবরাখবর পৌঁছিয়া থাকে। এক নম্বরের ক্ষুদ্র পাতাগুলিকে কোনোরূপে উত্তেজিত করিলে একটি মাত্র সূত্র দিয়া পত্রমূলের এক নম্বর পেশীতে উত্তেজনা প্রেরিত হয়, অমনি পাতাটি বাম দিকে পাক খাইয়া যায়। চারি নম্বরের পাতাগুলিকে ঐরূপে উত্তেজিত করিলে ডান দিকে পাক খায়। দুই নম্বরের পাতাগুলিকে উত্তেজিত করিলে বড়ো পাতাটি নীচের দিকে পড়ে। তিন নম্বরের ছোটো পাতাগুলিকে উত্তেজিত করিলে উপরের দিকে উঠিয়া যায়। সুতরাং দেখা যায়, পাতার বাহির দিক হইতে ভিতরের দিকে হুকুম পাঠাইবার চারিটি রাশ আছে। কে সেই বল্‌গা টানিয়া সংকেত পাঠায়?

কেবল তাহাই নহে। কোনো নির্দিষ্ট দিকে চালিত করিবার জন্য একটা বল্‌গা টানিলে তাহা সাধিত হয় না। নৌকার একটি দাঁড় টানিলে নৌকা কেবল ঘুরিতে থাকে। দিশাহীন তবে এক

দিকের টান! অন্ততঃ দুই দিকের দুইটি সমবেত টান দ্বারা গন্তব্যপথ নির্দিষ্ট হয়। এক সময়ে দুইটি দাঁড় টানা আবশ্যক।

পতঙ্গ আলোর দিকে ছুটিয়া যায়। তাহার দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে। প্রত্যেক চক্ষুর সহিত তাহার এক-একটি পাখার সংযোগ। একটি চক্ষু অন্ধ হইলে সে আর আলোর দিকে যাইতে পারে না। এক-দাঁড়ের নৌকার ন্যায় কেবল ঘুরিতে থাকে। যখন দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে, কেবল তখনই দুইটি ডানা একসঙ্গে একই বলে আন্দোলিত হয়, এবং সে সোজা পথে আলোর দিকে ধাবিত হয়। আলো যদি পাশে ঘুরাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উহা কেবল একটি চক্ষুর উপর পড়ে, সেইজন্য একটি পাখা প্রবল বেগে স্পন্দিত হয় এবং পতঙ্গটি ঘুরিয়া যায়। ঘুরিয়া যখন আলোর সোজাসুজি আলোমুখীন হয় এবং আলো দুইটি চক্ষুর উপর সমানভাবে পড়ে, তখন দুইটি পাখাই সমানভাবে একই শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে এবং পতঙ্গ তাহার অভীষ্ট লাভ করে—জীবনে কিংবা মরণে!

দুইটি দাঁড়ের দ্বারা তরণী কেবল নদীবক্ষের উপরই গন্তব্য দিকে ধাবিত হইতে পারে। কিন্তু সর্বদিগ্‌বিহারী জীব কখনও দক্ষিণে কখনও বামে, কখনও উর্ধ্বে কখনও বা অধোদিকে ধাবিত হইতে চাহে। এরূপ সর্বমুখী গতি নিরূপণ করিবার অন্ততঃ চারিটি রশ্মির আবশ্যক।

লজ্জাবতী পাতার প্রতি কোষই আলোক ধরিবার ফাঁদ।

সেই আলোর উত্তেজনা এক-একটি স্নায়ুসূত্র ধরিয়া পত্রমূলের পেশীতে উপস্থিত হয়। যতক্ষণ-না চারিটি ডাঁটার পত্রসমষ্টি সমানভাবে আলোকমুখীন হয়, ততক্ষণ চারিটি বল্‌গার টানের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। পত্ররথ তখন দক্ষিণে কিংবা বামে, ঊর্ধ্বে কিংবা নিম্নে চালিত হয়।

সবিতার রথ

সারথি তবে কে ? দিবাকর নিজকে কোটি কোটি অংশে বিভক্ত করিয়া ধরাপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত। জানালার ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া সূর্যদেবের শত শত মূর্তি মেঝের উপর দেখিতে পাই।

সবিতা তবে প্রতি পত্রকে তাঁহার রথরূপে গ্রহণ করেন। পত্রের চারিটি বল্‌গা তাঁহারই হস্তে। অনন্ত আকাশ বাহিয়া সীমাহীন তাঁহার গতি। কিন্তু এই অসীম পথ প্রদক্ষিণ করিবার সময়ও ধূলিকণার ন্যায় এই পৃথিবী এবং তাহা হইতে উত্থিত ক্ষুদ্র লতার অতি ক্ষুদ্র পাতাটিরও আহ্বান উপেক্ষা করেন না। নিজের শক্তির দ্বারা প্রতি জীববিন্দুকে স্পন্দিত করেন এবং ক্ষুদ্র পাতাটির গতি নিরূপণ করিয়া থাকেন। জীবন এবং জীবনের গতির মূলে সেই শক্তিই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

সর্বভূতের চালক তুমি, তোমার তেজোরাশিকে কে উদ্দীপ্ত রাখিতেছেন!

পরিশিষ্ট

নিরুদ্দেশের কাহিনী

প্র থ ম প রি চ্ছে দ

গত বৎসর এই সময়ে এক অত্যাশ্চর্য ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই বিষয় লইয়া বিলাতের *Nature*, ফরাসী দেশের *La Nature* এবং মার্কিন দেশের *Scientific American*এ অনেক লেখালেখি চলিয়াছে—কিন্তু এ পর্যন্ত কিছু মীমাংসা হয় নাই।

২৮এ সেপ্টেম্বর তারিখে *Englishman* কাগজে সিমলা হইতে এক তারের সংবাদ প্রকাশ হয়—

"Simla Meteorological Office, ২৭এ সেপ্টেম্বর :

"বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা।"

২৯এ তারিখের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল—

"Meteorological Office, 5, Russel Street :

"দুই দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। ডায়মণ্ড হারবারে Danger Signal উঠানো হইয়াছে।"

৩০এ তারিখে যে Special Bulletin বাহির হইল তাহা অতি ভীতিজনক—

"আধ ঘণ্টার মধ্যে Barometer দুই ইঞ্চ নামিয়া গিয়াছে। আগামীকল্য ১০ ঘটিকার মধ্যে কলিকাতায় অতি প্রচণ্ড ঝড় হইবে, এরূপ তুফান বহু বৎসর মধ্যে হয় নাই।"

বাংলা গবর্নমেণ্ট হইতে ডায়মণ্ড হারবারের Sub-Divisional Officerএর নিকট তারে খবর হইল—"Stop all outgoing vessels." এই সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে কলিকাতায় প্রচারিত হইল।

কলিকাতার অধিবাসীরা সেই রাত্রি কেহই নিদ্রা যায় নাই। আগামী কল্য কি হইবে তাহার জন্য সকলে ভীত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

Reuterএর Agent *Times*এ telegraph করিলেন—"The Capital of our Indian Empire in danger."

১লা অক্টোবর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

সমস্ত দিন মেঘাবৃত ছিল, কিন্তু বৈকালে ৪ ঘটিকার সময় হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। ঝড়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

তার পরদিন Meteorological Office খবরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"কলিকাতায় ঝড় হইবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে প্রতিহত হইয়া ঝড় অন্য অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।"

ঝড় কোন্ দিকে গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য দিক্‌দিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

তার পর *Englishman* লিখিলেন— এত দিনে বুঝা গেল যে বিজ্ঞান সর্বৈব মিথ্যা।

Daily News লিখিলেন— যদি তাহাই হয় তবে-গরিব টেক্স-দাতাদিগকে পীড়ন করিয়া Meteorological Officeএর ন্যায় অকর্মণ্য আফিস রাখিয়া লাভ কি?

তখন *Pioneer, Civil and Military Gazette, Statesman* তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন— উঠাইয়া দেও।

গবর্নমেণ্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অল্পদিন পূর্বে Meteorological Officeএর জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার থার্মোমিটার আনানো

হইয়াছে। সেগুলি এখন ভাঙা শিশি-বোতলের মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর Meteorological Officeএর বড়সাহেবকে অন্য কি কার্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে?

গবর্নমেণ্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা Medical Collegeএ লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমরা ইচ্ছা করি Medical Collegeএ একটি নূতন Chair স্থাপিত হয়। নিম্নলিখিত বিষয়ে lecture দেওয়া হইবে—'On the Effect of Variation of Barometric Pressure on the Human System'."

Medical Collegeএর Principal লিখিয়া পাঠাইলেন—"উত্তম কথা, বায়ুর চাপ কমিলে ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। তাহাতে সচরাচর আমাদের যে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে কলিকাতাবাসীরা আপাততঃ বহুবিধ চাপের নীচে আছে—

১ম চাপ	বায়ু	প্রতি বর্গইঞ্চে	১৫ পাউণ্ড
২য়	ম্যালেরিয়া		২০ পাউণ্ড
৩য়	পেটেণ্ট ঔষধ		৩০ পাউণ্ড
৪র্থ	ইউনিভারসিটি		৫০ পাউণ্ড
৫ম	ইনকম ট্যাক্স		৮০ পাউণ্ড
৬ষ্ঠ	মিউনিসিপাল ট্যাক্স		১ টন

"বায়ুর দুই-এক ইঞ্চি চাপের ইতর-বৃদ্ধি 'বোঝার উপর শাকের আটি' স্বরূপ হইবে। সুতরাং কলিকাতায় এই Chair স্থাপন করিলে বিশেষ উপকার যে হইবে এরূপ বোধ হয় না।

তবে সিমলা পাহাড়ে বায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে উক্ত Chair স্থাপিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।"

ইহার পর গবর্নমেণ্ট নিরুত্তর হইলেন। Meteorological আফিস এবারকার মত অব্যাহতি পাইলেন।

কিন্তু যে সমস্যা লইয়া এত গোল হইল, তাহা পূরণ হইল না।

একবার এক বৈজ্ঞানিক *Nature*এ লিখিয়াছিলেন বটে; তাঁহার theory এই যে, কোন অদৃশ্য ধূমকেতুর আকর্ষণে বায়ুমণ্ডল আকৃষ্ট হইয়া ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ বলিলেন যে, সেই সময় ছোটলাট ডায়মণ্ড হারবার পরিদর্শন করিতে যান। তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। তাঁহার ভয়ে ঝড় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে।

এ সব অনুমান মাত্র। এখনও এ বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। এবার Oxford British Associationএ Herr Stürm F.R.S., "On a Vanished Typhoon" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। তাহা লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা।

এই ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে একজন মাত্র জানে সে **আমি**। পরের অধ্যায়ে ইহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গত বৎসর আমার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। প্রায় একমাস কাল শয্যাগত ছিলাম।

ডাক্তার বলিলেন, সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে Ceylon যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তলরাশি একান্ত বিরল হইয়াছিল। একদিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দ্বীপ কাহাকে বলে?" আমার কন্যা ভূগোল-তত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার উত্তর পাইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিল "এই দ্বীপ"— ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিরলকেশ মসৃণ মস্তকে দু-এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তার পর বলিল, "তোমার ব্যাগে এক শিশি 'কুন্তলীন' দিয়াছি জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও, নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দু-একটি দ্বীপেরও চিহ্ন থাকিবে না।"

২৮এ তারিখে আমি *Chusan* জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। প্রথম দুদিন ভালোরূপই গেল। ১লা তারিখ প্রত্যুষে সমুদ্র এক অস্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিল, বাতাস একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, সমুদ্রের জল পর্যন্ত সীসার রঙের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

জাহাজের কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন, "যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতি সত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কূল হইতে বহু দূর— এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর শোক ও ভীতি -সূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারি দিক মুহূর্তের

মধ্যে অন্ধকার হইল। এবং দূর হইতে এক-এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তার পর মুহূর্তমধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে— পাতালপুরী হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্মুক্ত হইয়া পৃথিবী-সংহারে উদ্যত হইল।

সমুদ্র, বায়ুর গর্জনের সহিত স্বীয় মহাগর্জনের স্বর মিলাইয়া সংহার-মূর্তি ধারণ করিল।

তার পর অনন্ত উর্মিরাশি, একের উপর অন্যে আসিয়া একেবারে জাহাজ আক্রমণ করিল।

এক মহা-উর্মি আসিয়া জাহাজের উপর দিয়া চলিয়া গেল— মাস্তুল, Life-boat ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে লোকে যেরূপ জীবনের প্রিয়বস্তু স্মরণ করে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য এই, আমার কন্যা আমার বিরল কেশ লইয়া যে উপহাস করিয়াছিল, এ সময়ে তাহা পর্যন্তও স্মরণ হইল।

"বাবা, এক শিশি কুন্তলীন তোমার ব্যাগে দিয়াছি।"

হঠাৎ এক কথায় আর-এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে এ বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনি আমার ব্যাগ হইতে কুন্তলীনের শিশি খুলিলাম। তাহা লইয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ টলমল করিতেছিল।

উপরে উঠিয়া দেখি সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বতপ্রমাণ ফেনিল এক মহা-উর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া কুন্তলীন-বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, মুহূর্ত-মধ্যে তৈল সমুদ্র-ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈলস্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণপরেই সূর্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই। এবং এই কারণেই সেই ঘোর বাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল কুন্তলীনের সাহায্যে অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

শ্রী—

পুঃ—প্রায় ছয় মাস পরে *Scientific American*এ উপরোক্ত ঘটনার নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছিল—

THE SOLUTION OF A MYSTERY

The vanished cyclone of Calcutta remained so long a mystery to vex the soul of meteorologists. We are now glad to be able to offer an explanation of this seeming departure from all known laws that govern atmospheric disturbances.

It would appear that a passenger on board the *Chusan* threw overboard a bottle of KUNTALINE while the vessel was in the Bay of Bengal, and the

storm was at its height. The film of oil spread rapidly over the troubled waters, and produced a wave of condensation, thus counteracting the wave of rarefaction to which the cyclone was due. The superincumbent atmosphere being released from its dangerous tension, subsided into a state of calm. Thus by the merest chance, a catastrophe was averted.—*Scientific American.*

ছাত্রসমাজের প্রতি

ছাত্রসমাজের সভ্যগণ,

তোমাদের সাদর সম্ভাষণে আমি আপনাকে অনুগৃহীত মনে করিতেছি। তোমরা আমাকে একান্ত বিজ্ঞ এবং প্রবীণ মনে করিতেছ। বাস্তব পক্ষে যদিও জরা আমার বাহিরের অবয়বকে আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু তাহার প্রভাব অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমি এখনও তোমাদের মত ছাত্র ও শিক্ষার্থী। এখনও স্কুলে যাইবার পুরাতন গলিতে পৌছিলে স্মৃতিদ্বারা অভিভূত হই। আমার শৈশবের শিক্ষক-দর্শনে এখনও হৃদয় চিরন্তন ভক্তিপ্রবাহে উচ্ছ্বসিত হয়। তবে তোমাদের অপেক্ষা শিক্ষার জন্য দীর্ঘতর সময় পাইয়াছি ; অনেক ভুল সংশোধন করিতে পারিয়াছি এবং অনেক বার পথ হারাইয়া পরিশেষে গন্তব্য পথের সন্ধান পাইয়াছি। আজ যদি কোন ভুলচুক কিম্বা দুর্বলতার বিরুদ্ধে তীব্রভাষা ব্যবহার করি তবে মনে রাখিও যে সে সব কষাঘাত হইতে নিজেকে কোনদিন বঞ্চিত করি নাই। কুসুমশয্যায় সুপ্ত থাকিবার সময় অতীত হইয়াছে ; কণ্টকশয্যাই আমাদিগকে এখন জাগরিত রাখিবে।

এখন আমাদের দেশে সচরাচর দুই শ্রেণীর উপদেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ আমাদের জাতীয় দুর্বলতার চিত্র অতি ভীষণ রূপে চিত্রিত করেন। যে দেশে এরূপ জাতিভেদ ও দলাদলি, যে দেশ দাসত্বসুলভ বহু দোষে দোষী, যে দেশে পরস্পরে এত হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা দেখা যায়, সে দেশে কি কোনদিন উন্নতি হইতে পারে? আশ্চর্যের বিষয় এই যে এইরূপ ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণীর পর

তাহাদের নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় না। যদি যথার্থই বুঝিয়া থাক যে দেশে এরূপ দুর্দিন আসিয়াছে তবে কেন বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা কর না। আমি দেখিতে পাই ছাত্রদের মধ্যে, আমাদের নেতারা কেন এ কাজ করিলেন, কেন এ কাজ করিলেন না, এরূপ বচসা দ্বারাই সময় অতিবাহিত হয়। পরের কর্তব্য কি তাহা নিষ্পত্তি করিবার আমি কে? আমি কি করিতে পারি ইহাই কেবল আমার ভাবিবার বিষয়।

আবার অন্যদিকে এক দল আছেন যাহারা অতীত কালের কথা লইয়া বর্তমান ভুলিয়া থাকেন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আমাদের পূর্বপুরুষদের কিছুই অবিদিত ছিল না।' আমাদের পূর্ব ঐশ্বর্য যদি এতই মহান তবে আমাদের অধঃপতনের হেতু কি? ইহার প্রতিবিধান কি নাই? আমরা যদি সেই মহান পূর্বপুরুষদের প্রকৃত বংশধর হই তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহে পূর্বগৌরব অধিকার করিতে পারিবই পারিব।

পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ উপলক্ষে আমি দ্বিবিধ জাতীয় চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছি। একজাতীয় চরিত্র এই যে, তাঁহারা গতকালের স্মৃতি লইয়া বৃথাগর্বে ভুলিয়া আছেন। পৃথিবী যে স্থাবর নয়, ইহা যে চিরপরিবর্তনশীল এ কথা তাহাদের বোধগম্য হয় না। এইসব-ধর্মাক্রান্ত জাতির চিহ্ন পর্যন্ত পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাইতেছে। ইজিপ্ট আসীরিয়া এবং বাবিলন— ইহাদের গত স্মৃতি ছাড়া আর কি আছে?

চীনদেশে ভ্রমণকালে সে স্থানের বিখ্যাত কয়েকজন পণ্ডিতের সহিত আমার পরিচয় হয়। তখন জাপান মাঞ্চুরিয়া গ্রাস ব্যাপারে প্রবৃত্ত ছিল। আমি আমার চীনা বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি করিয়া চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন? তখন তাঁহারা বলিলেন,

চীনদেশের মত যে দেশ বহু প্রাচীন কাল হইতে সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সে দেশকে কি সেদিনের জাপান পরাভূত করিতে পারে। বরঞ্চ আমাদের সভ্যতাই জাপানকে পরাস্ত করিবে। এইসব কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে শীঘ্রই চীনের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হইবে।

অন্যদিকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান পুরাতন কথা বলিয়া সময় অপচয় করিতে চাহেন না। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া তাঁহারা যথেষ্ট ব্যস্ত। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম যে মানবসমাজের নিয়ম আর law of hydrostatic pressure একই। যে স্থানে pressure বেশি সে স্থান হইতে জলস্রোত অল্প pressureএর দিকে ধাবিত হয়। জীবন-স্রোতও সজীব হইতে নির্জীবের দিকে। পৃথিবীতে সজীব নির্জীবের স্থান অধিকার করিবে।

অথচ সেই জাপানে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে বিদ্যা ও বুদ্ধিতে ভারতবর্ষীয় ছাত্র সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানীদেরও উপরে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। বিদ্যাবুদ্ধির ত্রুটি নাই, তবে এরূপ দুর্দশা কেন।

আমি আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতার কাজ করিয়াছি। ইহার মধ্যে ন্যূনকল্পে দশ হাজার ছাত্রের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। তাহাদের চরিত্রে কি কি গুণ তাহা জানি আর কি কি দুর্বলতা তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। প্রধানতঃ, তাহাদের স্বভাব অতি কোমল, সাধারণতঃ তাহারা নম্রপ্রকৃতি, অতি সহজেই তাহাদের হৃদয় অধিকার করা যায়; এক কথায় তাহারা বড় ভালমানুষ, একবার পথ দেখাইয়া দিলে অনেকেই সেই পথ অনুসরণ করিতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ জলপ্লাবন, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি দুর্ঘটনার সময় ছাত্রদের মধ্যে অদ্ভুত কার্যপরায়ণতা দেখা গিয়াছে। এতগুলি ছেলে কি সুন্দররূপে নিজকে organise করিয়াছে। বেশি কথা না বলিয়া অতি সংযতভাবে কি সুন্দররূপে লোকসেবা করিয়াছে। এরূপ শুশ্রূষা করিবার ক্ষমতা, এরূপ ধৈর্য, এরূপ কষ্টসহিষ্ণুতা, এরূপ অসন্তুষ্টির অভাব সচরাচর দেখা যায় না। আমি যেসব গুণ বর্ণনা করিলাম তাহা পুরুষে প্রায় দেখা যায় না, সচরাচর নারীজাতিই এসব মহৎ গুণের অধিকারিণী।

ইহার বিপরীত কেন্দ্রে কোন কোন পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। তাঁহাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা একেবারেই নাই, তাঁহারা কিছুই মানিয়া লইতে চাহেন না, তাঁহারা সর্বদাই অসন্তুষ্ট, তাঁহাদের হৃদয় দুর্জয় ক্রোধে পূর্ণ। এইরূপ লোকের জাতীয় জীবনে স্থান কোথায় ?

আমি এইরূপ প্রকৃতির একজনকে জানিতাম তিনি চিরস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজের নির্মম বিধানে তাঁহার ক্রোধ সর্বদা উদ্দীপ্ত থাকিত। আশ্চর্য এই যে ক্রোধ ও মমতা অনেক সময় একাধারেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের ন্যায় কোমলহৃদয় আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? তিনি কোন বিধানই মানিয়া লইতেন না; অসীম শক্তিবলে তিনি একাই সমাজের কঠিন শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই প্রকার দুর্দান্ত ও ক্রোধপরায়ণ লোক কখন কখন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদের জীবন নিষ্ফলতাতেই পর্যবসিত হয়, তাহাদের ধৈর্য নাই, তাহাদের সহিষ্ণুতা নাই। দেশব্যাপী রোগের

সেবা ও পরিচর্যা? পীড়ারও অন্ত নাই, শুশ্রূষারও অন্ত নাই, এরূপ কতকাল চলিবে? ইহার কি প্রতিবিধান নাই? কি করিয়া ম্যালেরিয়া দেশ হইতে দূর করা যায়? এরূপ জঙ্গল ও ডোবার মধ্যে মানুষ কি করিয়া বাঁচিতে পারে? ইহার প্রতিকার নিশ্চয়ই আছে।

তা ছাড়া আরও শত শত কার্য আছে, সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার, জ্ঞান প্রচার, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি, দেশে বিদেশে ভারতের মহিমা বৃদ্ধি করা। দুর্বল ভালমানুষের দ্বারা এসব হইবে না, এইসবের জন্য বিক্রমশীল পুরুষের আবশ্যক, তাহাদের পূর্ণ শক্তির আঘাতে সব বাধাবিঘ্ন শূন্যে মিশিয়া যাইবে।

আর যে শান্তির ক্রোড়ে আমরা এতদিন নিশ্চেষ্ট ও সুপ্তভাবে জীবন যাপন করিয়াছি, জগৎ হইতে সেই শান্তি অপসৃত হইতেছে। শান্তি কোন জাতির পৈতৃক অথবা চিরসম্পত্তি নহে; বল দ্বারা, শক্তি দ্বারা, জীবন দ্বারা শান্তি আহরণ করিতে এবং রক্ষা করিতে হয়। বলযুক্ত হও, শক্তিমান্ হও, এবং তোমাদের শক্তি দেশের সেবায় এবং দুর্বলের সেবায় নিয়োজিত হউক।

'গ্রন্থপরিচয়' ও 'জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনাসূচী' মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর এই রচনাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে— এইজন্য ঐ দুই বিভাগে ইহার উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজের সভায় এই অভিভাষণ পঠিত বা কথিত হইয়া থাকিবে।

গ্রন্থপরিচয়

'অব্যক্ত' ১৩২৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনাসূচী'তে এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণাদির বিবরণ ও গ্রন্থান্তর্গত রচনাগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী যথাসাধ্য সংকলিত হইয়াছে, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিবরণ 'গ্রন্থপরিচয়ে' সংকলিত হইল।

'অব্যক্তে' গৃহীত সর্বপুরাতন রচনার পূর্বেও তিনি বাংলায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি ইংল্যাণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে সঞ্জীবনী পত্রিকায় একটি বাঙ্গলা প্রবন্ধ লেখেন। উহাতে ফসেট পরিবারে তিনি যে আদর ও প্রীতি পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে।"[১]

পৃ ১৮-৩৭। গাছের কথা। উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু। মন্ত্রের সাধন। এই রচনাগুলি মুকুল পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধের এই মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—

১ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু", প্রদীপ, মাঘ ১৩০৪। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন, তাঁহার সম্পাদিত দাসী পত্রিকায় ১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্রের প্রথম দিক্‌কার দুইটি রচনা প্রকাশিত হয়— সুবিখ্যাত "ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে" তাহার অন্যতম। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত প্রদীপ পত্রে লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া জগদীশচন্দ্র এই মর্মে সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন—"আমি তোমার কাগজে লিখিতে পারিলে বাস্তবিকই সুখী হইতাম। কিন্তু নানা কার্য্যে জড়িত হইয়া আমি এখন অনেক সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যে কার্য্যে বৃত হইয়াছি, তাহার কূলকিনারা দেখিতে পাই না—অনেক সময়েই কেবল অন্ধকারে ঘুরিতে হয়। বহু ব্যর্থ প্রযত্নের পর কদাচ অভীষ্টের সাক্ষাৎ পাই।"—প্রদীপে প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

"শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও আমি তাঁহারই উৎসাহে শিশুদের জন্য মুকুল নামক সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশের উদ্যোগ করি। অল্পদিন হইল তিনি এক পত্রে মুকুলের উন্নতিকল্পে আমায় কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন।"

মুকুল-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত পত্র-খানিও কৌতূহলজনক—

"১৬ই মার্চ্চ ১৯০০…লেখার জন্য আমার উপর বিশেষ তাড়া। আমি বলিয়াছি যদি আমার গৃহিণী আগামীবারে আমার সহিত শিলাইদহ উপস্থিত হন তাহা হইলে যতদিন থাকিব ততদিন মুকুলের জন্য আপনার এক একটি লেখা পাইব। [গৃহিণীর] Journalistic instinct অতিশয় প্রবল দেখিতেছি। বিশেষতঃ শ্রীযুক্তা সরলা দেবী নির্ব্বাপিত অগ্নিতে ইন্ধন দিয়া গিয়াছেন।…"

এই পর্বে মুকুলে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, যেমন, "ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে", "কোশল নৃপতির তুলনা নাই", "বসেছে আজ রথের তলায়", "নববৎসরে করিলাম পণ" ইত্যাদি কবিতা।

জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসু মুকুলে যে-সব প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন তাহা সংগৃহীত হইয়া প্রবন্ধাবলী নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩৪০)।

পৃ ৫৩। পলাতক তুফান। এই গ্রন্থের অন্যত্র 'জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনাসূচী'তে 'কুন্তলীন পুরস্কারের দ্বাদশ প্রথম' গ্রন্থের পরিচয়ে এই রচনার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

পৃ ৬৩। অগ্নিপরীক্ষা। "লেখক নেপালের সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণকালে এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ করেন।"[২]

পৃ ৭৩। ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে। "তিনি [জগদীশচন্দ্র] একবার আলমোরা হইতে যে তুষার-নদী (glacier) দেখিতে যান, ইহা তাহারই বর্ণনা।"[৩]

পৃ ৮২। বিজ্ঞানে সাহিত্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে (১৯১১) সভাপতির অভিভাষণ। গ্রন্থে পুনর্মুদ্রণকালে বর্জিত দুইটি অনুচ্ছেদ উদ্ধারযোগ্য—

"এই সভা বাংলা দেশের সাহিত্যসম্মিলন। ভারতসাগর যখন আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাসিত মেঘকে আকাশে সঞ্চিত করিয়া তোলে, তখন সে আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তখন তাহার বক্ষের উপর বাতাস বহিতে থাকে, এবং একদিন তাহার এই মেঘসঞ্চয়কে সে আপনার বঙ্গ-উপকূলে পাঠাইয়া দেয়। অবিরাম বায়ু তাহাকে এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে বিস্তীর্ণ করিয়া দিতে থাকে, দেখিতে দেখিতে দেশদেশান্তর সফলতায় ভরিয়া উঠে।

"তেমনি বাংলা দেশের চিত্তসাগর হইতে যে-সকল উচ্ছ্বাস নানা আকার ধরিয়া এখানকার আকাশে সঞ্চিত হইতেছে, সে কি কোন দিক্‌প্রান্তে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে?"

এই প্রসঙ্গে, 'নবীন ও প্রবীণ' প্রবন্ধের পরিচয়ও দ্রষ্টব্য।

---

২ পূর্ব সংস্করণে প্রবন্ধের পাদটীকা

৩ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় -লিখিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

পৃ ১১৪। নবীন ও প্রবীণ। জগদীশচন্দ্র বসু ১৩২৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিপদে বৃত হইলে প্রথম মাসিক অধিবেশনে যে অভিভাষণ পাঠ করেন ইহা তাহারই সংশোধিত রূপ।

এই প্রসঙ্গে পরিষদের সহিত জগদীশচন্দ্রের যোগের কথা বিবৃত হইল—

পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য

জগদীশচন্দ্র ১৩১৮ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিপদে বৃত হন, ১৩২৩ সালে তিনি পরিষদের সভাপতিত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু তাহার পূর্বেই পরিষদের সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন, ১৩১০ সালে পরিষৎ-কর্তৃক বিশিষ্ট সদস্যপদে নির্বাচনের সূত্রে। প্রথমাবধি পরিষদে 'সাহিত্যকে কোনও ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই', এখানে 'আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি,' এজন্য সাহিত্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানসাধকের স্থানও পরিষদে সসম্মানে স্বীকৃত হইয়াছে; বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে, সভাপতিপদে রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তন করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, পরে তিনি পরিষদের সভাপতির আসনও অলংকৃত করেন।

প্রায় দুই বৎসরকাল বিলাতে অবস্থানপূর্বক বিদেশে বিজ্ঞানীসমাজে নিজের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৩০৯ সালে জগদীশচন্দ্র দেশে প্রত্যাগত হইলে দেশের শিক্ষিতসমাজে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। জগদীশচন্দ্রকে বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্বাচিত করিয়া পরিষৎ এই আনন্দের অংশী হইয়াছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও এই বৎসর (১৩১০) পরিষদের

বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। ইহার পূর্বেই সহজ ভাষায় কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া জগদীশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সহিত একাত্মতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন এখন স্মৃতিমাত্র, অনুরূপ অন্যান্য সম্মিলন এখন তাহার স্থান লইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে এই বার্ষিক মিলন-সভা যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তদবধি যতকাল ইহা জীবিত ছিল এই সম্মিলন দেশের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছে। ১৩১৮ সালে ময়মনসিংহে চতুর্থ অধিবেশনে সম্মিলনের সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন জগদীশচন্দ্র। সাহিত্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানসেবকের স্থান আছে কি না, অভিভাষণের সূচনায় এই আলোচনাপ্রসঙ্গে সাহিত্যের একটি উদারমূর্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিবার কথা যে তিনি বলিয়াছিলেন, এখনও তাহা স্মরণ করিবার আবশ্যকতা আছে।

সেই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মনে পড়ে, এই যুগেই বাংলা দেশে শ্রেষ্ঠ কবি ও বিজ্ঞানীর যে যোগ হইয়াছিল তাহার কথা। জগদীশচন্দ্র স্বয়ংও কবি-মনীষী, 'আদি কবির প্রতিচ্ছবি'[৪] বলিয়া দেশে-বিদেশে অভ্যর্থিত হইয়াছেন; তিনি বিজ্ঞানকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহারও মূলকথা বর্ণিত হইয়াছে এই অভিভাষণে।

বিজ্ঞান-সাহিত্যের আলোচনা ও সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন সাহিত্য-পরিষদের 'উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়' বলিয়া প্রথমাবধিই স্বীকৃত; ময়মনসিংহ অধিবেশনের

---

৪ দ্রষ্টব্য, পরে উদ্‌ধৃত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত -কৃত 'আচার্য-প্রশস্তি'

পর হইতে সাহিত্য-সম্মিলনের একটি 'বৈজ্ঞানিক বৈঠক' বা বিজ্ঞান-শাখাও গঠিত হয়।

পরিষদের সভাপতি

১৩২৩ সালের ১৪ শ্রাবণ দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে, 'নবীন ও প্রবীণ' উভয় দলের শ্রদ্ধাভাজন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সভাপতিপদে বৃত হন। প্রথম মাসিক অধিবেশনে (৪ ভাদ্র ১৩২৩) উপস্থিত হইয়া তিনি পরিষদের উন্নতিকল্পে যে-সকল প্রস্তাব করেন, কার্যবিবরণীতে তাহার আভাস আছে—

"প্রথমে তিনটি বিষয়ে এই সভার উন্নতি করিতে আমি ইচ্ছা করি। একটা বিষয় আজ বলিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, অল্পদিনে সাহিত্য-পরিষৎ উচ্চস্থান অধিকার করিবে। ফরাসী দেশে যে French Academy of Literature আছে, পরিষদকে তাহার তুল্য করিতে হইবে। সেখানকার নানা ছবি ও নানা দুর্লভ পুস্তক এমন সুবিন্যস্ত ভাবে সাজানো আছে যে, সেখানে প্রবেশ করিলে লোকমাত্রেরই কেমন একটা তন্ময়ভাবে আসে— Academyর সৌন্দর্যে ও মহত্ত্বে যেন মন মুগ্ধ হয়। পরিষদ-গৃহে আসিলে যেন সেইরূপ ভাব আসে, সেইরূপ ভাবে পরিষৎকে গড়ে তুলতে হবে। অনেক অমূল্য জিনিস এখানে আছে, বহু বড়লোকের হাতের লেখা, রামমোহন রায়ের পাগড়ি, বঙ্কিমের কলম ইত্যাদি অনেক জিনিস আছে, কিন্তু তাহার সুবিন্যাস নাই। এখন পরিষৎকে এমন করিতে হইবে যে, কেহ আসিয়া জানিতে পারে যে, ইহা একটি মস্ত কীর্তি।...পরিষদের সমস্ত

সদস্যদের চিঠি লিখে জানাতে হবে যে, প্রত্যেকে এক এক বন্ধুকে দিয়ে পরিষদের এক এক সেট বই কিনিয়ে দেন।…এই সমস্ত বিষয় কার্যে আনিতে গেলে সকলকে চেষ্টা করে কিছু কিছু টাকা দিলেই এ কাজ সুসিদ্ধ হইতে পারে। জানুয়ারি মাসের মধ্যে এ কাজটা সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি নিজে ১০০৲ দিতে প্রস্তুত আছি।”

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (৪ পৌষ ১৩২৩) সভাপতিরূপে জগদীশচন্দ্র বলেন—

“এই সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির যাহাতে কেবল নামে মাত্র পর্যবসিত না হয়, দেশবাসীর নিকট যাহাতে নামে ও কর্মে মন্দির বলিয়া গণ্য হয়, আমি সেইরূপ ইচ্ছা করি। আমি ইহাকে দেশীয় ভাবে ও দেশীয় প্রথায় সাজাইব ইচ্ছা করিয়াছি।…এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃভূমিকে বড় করিতে হইবে।…”

কেবল যে পরিষদের শিল্পসৌন্দর্যবিধানের দিকে জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল তাহা নহে, তাঁহার কার্যকালে (১৩২৩-২৫) তিনি ইহার বৈষয়িক উন্নতিসাধন, কর্মীদের মধ্যে মতদ্বৈধের দূরীকরণ, সর্বোপরি, পরিষদের মূল উদ্দেশ্য ‘সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন’, এ-সকল বিষয়েই উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন এবং সে উদ্‌যোগ বহুলপরিমাণে ফলপ্রসূও হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণ (৫ চৈত্র ১৩২৪)[৫] এবং পরিষদের কার্যবিবরণ হইতে তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ সংকলিত হইল—

৫ ইহাই সংক্ষিপ্ত আকারে “নবীন ও প্রবীণ” নামে ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহাতে বৈষয়িক ও একান্ত সাময়িক প্রসঙ্গ বর্জিত। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনবোধে মূল প্রবন্ধ হইতে কোন কোন অংশ উদ্‌ধৃত হইল।

"...স্থির করিলাম, সাহিত্য-পরিষদের জন্য যথাসাধ্য কার্য করিব এবং ইহার পূর্ণশক্তি বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইব। যে মুমূর্ষু, সে-ই মৃত বস্তু লইয়া আগলাইয়া থাকে, যে জীবিত, তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইয়াছি যে, এই বর্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ লইয়া থাকিবে না, বর্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি জীবন্ত সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে ইহাই আমি সাহিত্য-পরিষদের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিবার পথে যে বাধা, যে অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিতে হইবে; তাহার পর দেশের চিন্তাশীল মনীষীদিগের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা যাহাতে একত্রীভূত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য যত্নবান হইতে হইবে।

"সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াই পরিষদের কতকগুলি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমি দেখি, স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে যে ঋণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরিশোধের বিশেষ উপায় দেখা যাইতেছে না। অনেক অমূল্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে এমন পুস্তকও প্রকাশিত হইতেছে, যাহা আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে। মনে হইল, কেবল সাহিত্যচর্চা করিতে যাইয়া বর্তমান জীবন্ত সাহিত্যের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। সভ্যদিগের নিকট অনেক টাকা অনাদায় হইয়া রহিয়াছে। পরিষদের আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশি; দেখি, পুস্তকাগারের কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই; পরিষৎ হইতে প্রকাশিত রাশি রাশি অবিক্রীত পুস্তক পরিষদ-ভবনে এরূপ স্তূপীকৃত হইতেছে যে, তথায় মনুষ্যের চলাচল দুর্গম হইবে।

অমূল্য শিলালিপি, তৈলচিত্র, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি এরূপ ভাবে বিক্ষিপ্ত আছে, যাহাতে প্রবেশমাত্র দর্শকের মনে এই মন্দিরের বিশালত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপাদন করে।...

"শুনিয়া সুখী হইবেন যে, এত অনটন সত্ত্বেও গত দুই বৎসর পুস্তকাদি প্রকাশ বা গৃহসংস্কারাদি কোন কারণেই স্থায়ী ভাণ্ডারের ঋণ বৃদ্ধি হয় নাই। বরং এই দুই বৎসরে আমরা দেড় হাজার টাকা ঋণ শোধ করিতে সমর্থ হইয়াছি।...

"পূর্বেই বলিয়াছি যে, অবিক্রীত পুস্তক-স্তূপ জঞ্জালপ্রায় হইয়া পরিষৎ-ভবনে চলাফেরার পথ বন্ধ করিয়াছিল। আরও বহু বিশৃঙ্খলা ছিল, সে সব দূর না করিলে পরিষদের বিকাশ অসম্ভব হইত। নূতন আলমারি, বক্তৃতাগৃহে বসিবার আসন, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আরম্ভ করিতেই অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকার আবশ্যক হইয়াছিল। এতদর্থে আমাদের অবিক্রীত পুস্তকরাশি গ্রন্থাবলীর সেট করিয়া স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্থানাভাব দূর হইয়াছে এবং আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের অধিক প্রচার হইয়াছে। ১৩০৭ হইতে ১৩১৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসরে গড়ে ১০০৲ টাকার পুস্তক বিক্রী হইত। তাহার পর ১৩২২ সাল পর্যন্ত গড়ে ৮০০৲ টাকা বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসরে পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের দ্বারা ৩৫০০৲ টাকা অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব বৎসরের চতুর্গুণ মূল্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ভবিষ্যতে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ১৭০০৲ টাকা রাখিয়া মন্দিরের সৌষ্ঠবের জন্য ১৮০০৲ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।...

"এখন মন্দিরের কিরূপ সৌষ্ঠব বাড়িতেছে, তাহা আপনারা দেখিতেছেন। তৈলচিত্র, প্রাচীন শিলা ও মুদ্রা যথাযথ প্রদর্শিত হইবার

ব্যবস্থা হইয়াছে। সমস্ত পুস্তকাগার সুসজ্জিত হইয়াছে। পুস্তকতালিকা শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে। পড়িবার স্থান প্রশস্ত হইয়াছে এবং মৌলিক গবেষণার জন্য দুইটি ক্ষুদ্র কামরা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

"যে সব বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলাম, তাহা কার্য করিবার উপলক্ষ্য মাত্র। সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদর্থে প্রতিভাশালী মনীষীদিগের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

"বসু-মহাশয় স্বয়ং এবং তাঁহার আহ্বানে শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, চুনীলাল বসু, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকে পরিষদ্-মন্দিরে লোকরঞ্জক বক্তৃতা দান করেন।"[৬] জগদীশচন্দ্র ১৩২৪ সালের ৭ চৈত্র "আহত উদ্ভিদ্" সম্বন্ধে ও ১৩২৭ সালের ১৯ চৈত্র "স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনাপ্রবাহ"[৭] সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সভাপতির অভিভাষণে জগদীশচন্দ্র পরিষদে নবীন-প্রবীণে দলাদলি[৮] সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন দেশের সকল প্রতিষ্ঠান-প্রসঙ্গেই তাহার স্থায়ী মূল্য আছে।

---

৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "পরিষৎ-পরিচয়", প্রথম সংস্করণ। এই সংকলনে ব্যবহৃত অন্যান্য কতকগুলি তারিখও 'পরিষৎ-পরিচয়' হইতে গৃহীত।

৭ এই দুই বিষয়ে রচনা 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

৮ পরিষদের চতুর্বিংশ কার্যবিবরণে এ বিষয়ে লিখিত হইয়াছে—

"আমাদের সভাপতি মহাশয় এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। এই সকল মতভেদ দূর হইয়া, যাহাতে সদস্যদের মধ্যে কোন প্রকার অপ্রীতি না থাকে তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি উভয় পক্ষের মতামত গ্রহণ করিয়া, নিজ মন্তব্য সহ কতকগুলি নিয়ম পরিবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন।"

পরিষদে সংবর্ধনা

ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বিজ্ঞানীসমাজে স্বীয় আবিষ্কার প্রচারান্তে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার সংবর্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন (১৫ শ্রাবণ ১৩২২)। "উত্তরে তিনি [জগদীশচন্দ্র] বলেন যে, বিদেশে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তিনি যে সম্মান পাইয়াছেন তাহা তাঁহার দেশেরই প্রাপ্য।"

এই সভায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে 'আচার্য-প্রশস্তি' করেন ১৩২২ ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসী হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যখন স্বদেশে ফিরিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হয়েন, তখন যে সকল ছাত্র তাঁহার পদমূলে উপবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞানের ক খ শিখিয়াছিল, আমি তাহাদের অন্যতম। অতএব তাঁহার সম্বর্ধনা-উপলক্ষে কিছু বলিতে সংকোচ বোধ করিতেছি। বিজ্ঞানক্ষেত্রে আচার্য মহাশয় যে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যে জন্য ভারতবাসীর নাম জগতে এখন ঘোষিত হইতেছে, তজ্জন্য তাঁহার স্বদেশবাসী মাত্রেই গৌরব অনুভব করিতেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরীক্ষা করিয়া facts সংগ্রহ করেন, সজ্জিত করেন, ব্যাপার লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই সকল facts ও ব্যাপার হইতে অদ্ভুত মনীষাবলে সত্যের আবিষ্কার করেন, নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদ্‌কে যদি বৈজ্ঞানিক বলা হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিককে প্রাজ্ঞানিক বলা উচিত। বিজ্ঞানের উপর

প্রজ্ঞান, সেই প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহারা তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করেন। এই প্রজ্ঞানকে পাশ্চাত্যগণ scientific imagination আখ্যা দিয়াছেন।

"জড়ের যে জীবন আছে, উদ্ভিদের যে প্রাণন আছে, উভয়ের যে ক্লান্তি স্ফূর্তি আছে, উভয়ের মধ্যে যে প্রাণশক্তি ক্রীড়া করিতেছে, আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থে এ কথা অনেকস্থলে উল্লিখিত দেখা যায়। অতএব এ সকল কথা আমরা অনেক দিন শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কানে শুনা আর চক্ষে দেখায় অনেক অন্তর। আমরা যে সকল কথা কানে মাত্র শুনিয়াছিলাম, আচার্য মহাশয় তাহা আমাদিগকে চক্ষে দেখাইয়াছেন। এখন আমরা এই সকল প্রাচীন উপদেশের সারবত্তা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একজন পাশ্চাত্য লেখক তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক যাদুকর আখ্যা দিয়াছেন। এ-নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছে।

"এ দেশে যাঁহারা সত্য দর্শন করিতেন, তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহাদিগের প্রাচীন নাম ছিল কবি। যিনি বৈদিক সত্যের আদি স্রষ্টা, প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহাকে আদি কবি বলে—

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র সেই আদি কবির প্রতিচ্ছবি। তিনিও তত্ত্বদ্রষ্টা, সত্যের আবিষ্কর্তা। অতএব তাঁহার সমক্ষে আমাদের শির আপনি প্রণত হইতেছে। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

১৯২০ সালে কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইউরোপের বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিজ্ঞানীসমাজে পুনরায় স্বীয় আবিষ্কার প্রচার করিয়া (এই বৎসরেই তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন) জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে ১৩২৭ সালের মাঘ মাসে পরিষৎ তাঁহাকে

সোনার দোয়াত-কলম দিয়া সংবর্ধনা করেন। ১৩৩৫ সালে জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে পরিষৎ তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দান করেন।

জগদীশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার সহধর্মিণী, বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার চর্চার জন্য পরিষৎকে তিন হাজার টাকা দান করিয়া একটি স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপন করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে-রূপ জগদীশচন্দ্র কল্পনাদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ আছে ময়মনসিংহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' প্রবন্ধের 'উপসংহারে'।

পৃ ১২১। বোধন। 'বিক্রমপুর সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ ১৯১৫।'[৯] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে জগদীশচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর অঞ্চলে রাড়িখাল গ্রামে।

পৃ ১৪২। নিবেদন। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা (৩০ নভেম্বর ১৯১৭) উপলক্ষ্যে ভাষণ।

এই অনুষ্ঠানের একটি বিবরণ ১৩২৪ পৌষ সংখ্যা 'সাহিত্য' হইতে অংশতঃ উদ্ধৃত হইল—

"বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব

"গত ১৪ই অগ্রহায়ণ [১৩২৪] অপরাহ্ণে বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের চিরজীবনের কামনা পূর্ণ হইয়াছে। কলিকাতায় সারকুলার রোডে আচার্যের বাসভবনের উত্তর পার্শ্বে 'বসুর বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র 'ভারতের গৌরব ও জগতের

---

৯ পূর্বসংস্করণে প্রবন্ধের পাদটীকা।

কল্যাণ কামনায়' তাঁহার 'বিজ্ঞান-মন্দির দেবচরণে নিবেদন' করিয়াছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বৈদিক মন্ত্রে আচার্যপদে ব্রতী হইয়া বৈদিক মন্ত্রে শিষ্যগণকে দীক্ষিত করিয়াছেন। শিষ্যবর্গও বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।...

"বক্তৃতাশালার অভ্যন্তরে ছাদে চন্দ্রাতপের মত ভারতের চিরন্তন প্রতীক শতদল দলে দলে ফুটিয়া আছে। অনুভূতি-প্রবণ উদ্ভিদের সুবিন্যস্ত মালা সেই সহস্রার-কমলকে বেষ্টন করিয়া জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কারের দ্যোতনা করিতেছে। বেদীর পশ্চাতে প্রাচীরে রূপক-চিত্রে নন্দলাল নবভারতের সনাতন আদর্শকে নূতন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।— পুণ্য প্রবাহিণীর পবিত্র পুলিন হইতে জ্ঞান-বিগ্রহ অগ্রসর হইতেছেন ;— তাঁহার দৃষ্টি অনন্তে সম্বদ্ধ। তাঁহার পার্শ্বে নারী— শক্তি পুরুষকে প্রেরণা দিতেছেন।...সার্ জগদীশচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা চিত্রকরের কল্পনায় অপূর্ব মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সমগ্র জাতিকে গন্তব্য তীর্থের ইঙ্গিত করিতেছে।

"ছবির নীচে রক্ত-পতাকায় 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্র অঙ্কিত। শব্দদ্বয়ের মধ্যে বজ্র।...ত্যাগের অবতার দধীচি 'লোক-হিতার্থায় জগদ্ধিতায় চ' আপনার অস্থি দান করিয়া মানব-সমবায়ে নিষ্কাম ধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই অস্থিনির্মিত বজ্রে দানব-শক্তির অপচয় ও দেব-শক্তির উপচয় হইয়াছিল।— সেই 'বজ্র' আচার্য জগদীশের আরাধ্যা বিজ্ঞানলক্ষ্মীর মন্দিরের প্রতীক! দধীচির সেই বজ্র ও ভারতীয় সাধকের জয়-বাণী 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্র গঙ্গা-যমুনার মত মিলিয়াছে। শক্তি ও ভক্তির অতুলনীয় সম্মিলন। এ প্রতীক সার্থক হউক, ধন্য হউক, হে ভগবান!

"বেদীর সম্মুখভাগে স্বর্ণ রজত ও তাম্রে নির্মিত সূর্য-বিগ্রহ। ধ্বান্তারি, সর্বপাপঘ্ন দিবাকর সপ্তাশ্ব রথে অয়ন-পথে যাত্রা করিয়াছেন। অন্ধকার অন্তর্হিত, আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। মহাদ্যুতি কাশ্যপেয় কিরণের— আলোকের— প্রকাশের দেবতা; তাঁহার প্রসাদে বিজ্ঞানলক্ষ্মীর এই মন্দির জ্ঞান-ময়ূখমালায় চিরসমুজ্জ্বল থাকুক। অজ্ঞানের অন্ধকার অন্তর্হিত হউক— এই মন্দিরে প্রতিফলিত আলোকে বিশ্ববাসীর চিত্তে সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। ভারত ধন্য হউক; আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা সিদ্ধ হউক; 'প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ' তাঁহার অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের দীপ হইতে ভারতে— বিশ্বে অগণিত দীপ জীবনের জ্যোতি সঞ্চয় করুক।

"ছয়টার পর জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সমগ্র সভাজন দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সংবর্ধনা করিলেন। সম্মুখে রক্তকৌষেয়-পটে দেদীপ্যমান বজ্রে, বন্দে মাতরম্ মহামন্ত্রে, এবং জগদীশচন্দ্রের বিগ্রহে— জাতির নব-তীর্থের যাত্রী পুরুষোত্তমের অবভাস দেখিলাম।...

"সুমধুর সংগীতের পর জগদীশচন্দ্র বৈদিক মন্ত্রে আচার্যপদে বৃত হইলেন। আচার্য-বরণের পর বৈদিক মন্ত্রে তিনি কয়েকজন শিষ্যকে দীক্ষা দিলেন; তাঁহারাও বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাহার পর সার্ রবীন্দ্রনাথের রচিত 'আবাহন' সংগীত গীত হইল—

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!...

"সংগীতের অবসানে আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন।...তাহার পর রবীন্দ্রনাথের রচিত ভারতভাগ্যবিধাতার বন্দনা— বাঙালীর আশার গান, আকাঙ্ক্ষার গান, ভক্তির গান, শক্তির গান, মুক্তির গান, ভারতের মর্মবাণী— সমবেতকণ্ঠে গীত হইল—

জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !...

"সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সংগীত শ্রবণ করিলেন।

"তাহার পর, যাহাদের জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহারা— বাংলার নন্দদুলাল— বাঙালীর উত্তরপুরুষগণ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে হুঙ্কার করিয়া প্রাণশক্তির ও বাঙালীর মর্মগত ভক্তির পরিচয় দিয়া সমবেত ভক্ত-সম্প্রদায়ের ভক্তিনম্র চিত্ত আশায় উদ্দীপ্ত করিলেন।— সভাভঙ্গ হইল।"

পৃ ১৫৩। 'আর একজনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্বনিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য আমার দুঃখ এবং পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে'— সহধর্মিণী অবলা বসু সম্বন্ধে উল্লেখ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

পৃ ১৫৩। 'যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন তখনও দুই-একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।'—বিশেষভাবে ভগিনী নিবেদিতা ও ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন বলিয়া গণনীয়।

এই প্রসঙ্গে, জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জয়ন্তী-উৎসবে তাঁহার ভাষণের একাংশ উদ্ধৃতিযোগ্য—

"...In all my efforts I have not altogether been alone. In days of our common obscurity my life-long friend Rabindranath Tagore was with me. Even in those doubtful days his faith never faltered."[১০]

পৃ ১৫৭। 'পতাকাস্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত'—পতাকায় বজ্রচিহ্নের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা যাঁহারা জানিতে চান তাঁহারা ১৯০৯ নভেম্বর সংখ্যা মডার্ন রিভিউ পত্রে R. S. স্বাক্ষরে প্রকাশিত "The Vajra as a National Flag" প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিতে পারেন। এই প্রবন্ধের আরম্ভে আছে—

"The question of the invention of a flag for India is beginning to be discussd in the press. Those who contemplate the desirability of such a symbol, however, seem to be unaware that already a great many people have taken up, and are using, the ancient Indian *Vajra* or Thunderbolt, in this way..."

ভগিনী নিবেদিতার অনেক গ্রন্থের মলাটেও বজ্রচিহ্ন প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পৃ ১৫৯। দীক্ষা। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে বিজ্ঞানচর্চায় যাঁহারা সহকর্মী ছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, এইরূপ অনুমান হয়।

পৃ ১৬২। আহত উদ্ভিদ। 'সাহিত্য-পরিষদে বক্তৃতা ১৯১৯'।[১১]

---

১০ "Sir Jagadish Chandra Bose ; Seventieth Birthday Celebration", *The Calcutta Municipal Gazette*, 8 December 1928, p 195

১১ পূর্বসংস্করণে প্রবন্ধের পাদটীকা

পৃ ১৮২। স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনাপ্রবাহ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এই বিষয়েও জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই দুইটি প্রবন্ধ প্রসঙ্গে 'নবীন ও প্রবীণ' প্রবন্ধের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পৃ ২০৩। বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী। অব্যক্ত প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর, ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে জগদীশচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। বর্তমান শতবার্ষিক সংস্করণে এটি সংযুক্ত হইল।

পৃ ২১৩। নিরুদ্দেশের কাহিনী। 'পলাতক তুফান' রচনার আদিরূপ।

অব্যক্তে প্রকাশিত রচনা যেগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলির সাময়িক পত্রের পাঠ ও অব্যক্তে প্রকাশিত পাঠ তুলনা করিলে দেখা যায়, অব্যক্তে প্রকাশকালে অনেক-স্থলে রচনাগুলির পরিমার্জনা ঘটিয়াছে। এই তুলনাকার্যে শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা লাভ করিয়াছি। বর্তমান সংস্করণেও পূর্ববৎ পরিমার্জিত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে, তবে প্রাসঙ্গিকবোধে কোনো কোনো বর্জিত অংশ গ্রন্থপরিচয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে—'পলাতক তুফান'-এর পূর্বরূপ 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' পরিশিষ্টে সম্পূর্ণই মুদ্রিত হইল।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনা-সূচী

পুস্তিকা ও গ্রন্থ

সভাপতির অভিভাষণ। পৃ ১৪, পরিশিষ্ট [/০]। Printed by Pulin Bihari Das from "Debakinandan Press", 66 Manicktola Street, Calcutta.

আখ্যাপত্র বা লেখকের নাম নাই।

১৩২৪ সালের ৫ চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে পরিষৎ-সভাপতি জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক পঠিত। "শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। এই অধিবেশন সেই অভিভাষণ পাঠের জন্য আহূত হইয়াছিল।"

এই পুস্তিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্বিংশ ভাগের চতুর্থ সংখ্যার (১৩২৪) ক্রোড়পত্র-রূপে অন্তর্ভুক্ত। জগদীশচন্দ্রের অব্যক্ত গ্রন্থে "নবীন ও প্রবীণ" নামে এই অভিভাষণ পুনর্মুদ্রিত, সাময়িক বিবরণ পরিবর্জিত।

অব্যক্ত। আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, এফ্‌, আর, এস্‌। মূল্য ২॥০। পৃ [।৶০], ২৩৪। প্রকাশ-তারিখ আশ্বিন ১৩২৮। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

সূচী :

---

১২ প্রথম সংস্করণে '১৮৯৪' তারিখ দেওয়া আছে। বর্তমান সংস্করণে বিভিন্ন প্রবন্ধে সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশের তারিখ যথাসাধ্য সংকলিত হইল।

গাছের কথা ॥ মুকুল, আষাঢ় ১৩০২

উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু ॥ মুকুল, ভাদ্র ১৩০২

মন্ত্রের সাধন ॥ মুকুল, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩০৫

অদৃশ্য আলোক ॥[১৩]

পলাতক তুফান ॥ কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৩

অগ্নিপরীক্ষা ॥ দাসী, মে ১৮৯৫

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে ॥ দাসী, এপ্রিল ১৮৯৫

বিজ্ঞানে সাহিত্য ॥ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৮

নির্ব্বাক জীবন ॥

নবীন ও প্রবীণ ॥ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুর্বিংশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা (১৩২৪) : ক্রোড়পত্র, 'সভাপতির অভিভাষণ'

বোধন ॥ প্রবাসী, মাঘ ১৩২২

মনন ও করণ ॥

রাণী-সন্দর্শন ॥ ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৮

নিবেদন ॥ নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ ; প্রবাসী, পৌষ ১৩২৪ ; সাহিত্য, পৌষ ১৩২৪

দীক্ষা ॥

আহত উদ্ভিদ ॥ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৬

স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনাপ্রবাহ ॥

হাজির ॥ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৮

---

১৩ রচনাটি ১৩২৮ ভাদ্র সংখ্যা মোসলেম ভারত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তবে ইহা পুনর্মুদ্রণ হইতে পারে। রচনাটি তাহার বহুপূর্বের বলিয়া অনুমান হয়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-কর্তৃক এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়— বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী তাহার প্রকাশ-তারিখ ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৮। বহু বৎসর পরে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ -কর্তৃক এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয় (১৩৫৮ ও ১৩৬৪)।

নবীন ও প্রবীণ ব্যতীত, অব্যক্ত গ্রন্থে সংকলিত আরও কোনও কোনও রচনা পূর্বে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে এরূপ অনুমানের কারণ আছে, যথা 'বিজ্ঞানে সাহিত্য,' ও 'নিবেদন'। এগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' অভিভাষণের একটি ইংরেজি রূপও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল—

LITERATURE AND SCIENCE. Substance of the Presidential Address given by the author in Bengali at the Literary Conference at Mymensingh, April 14, 1911. Pp. 16. [8 May 1911].

প্রবন্ধাবলী। বিজ্ঞানাচার্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী বসু। ১৩৪০। প্রকাশক শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, ৫।১ সুইনহো রোড, কলিকাতা।

ইহার প্রথমাংশে মুদ্রিত গাছের কথা ও মন্ত্রের সাধন প্রবন্ধ জগদীশ-চন্দ্রের রচনা, অব্যক্ত গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত। অপর রচনাগুলির অধিকাংশই অবলা বসু মহোদয়ার রচনা, তাঁহার স্বাক্ষরে মুকুলে প্রকাশিত হয়[১৪]; সম্ভবতঃ অন্য কয়টিও তাঁহারই লিখিত।

---

১৪ শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপার্থ বসু অনুগ্রহপূর্বক পুরাতন 'মুকুল' পত্র হইতে, এই রচনাগুলি যে অবলা বসুর, তাহা সন্ধান করিয়া দিয়াছেন।

পত্রাবলী। জগদীশচন্দ্র বসু। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শতবার্ষিকী-সমিতি, ৯৩৷১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা। শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশ ৩০ নভেম্বর ১৯৫৮।

এই পত্রসংগ্রহে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ৮৮খানি দেবকুমার রায় চৌধুরীতে লিখিত ১খানি ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ২খানি চিঠি সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ৮খানি ও শ্রীহেমলতা ঠাকুরকে লিখিত ১খানি অবলা বসুর চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে।

জগদীশচন্দ্রের রচনা-সংবলিত গ্রন্থ

কুন্তলীন পুরস্কারের দ্বাদশ প্রথম। (১৩০৩-১৩১৫) প্রকাশক —এইচ বসু, পারফিউমার, দেলখোস হাউস, কলিকাতা। ১ বৈশাখ. ১৩১৭।

এইচ বসু (হেমেন্দ্রমোহন বসু)-প্রবর্তিত কুন্তলীন গল্প-পুরস্কার-প্রতিযোগিতা বাংলা সাহিত্যে এক সময় সুপরিচিত ছিল— শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রাপ্ত গল্প, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও হেমেন্দ্র-মোহন বসুর জন্য গল্প লিখিয়াছেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলি প্রতিবৎসর কুন্তলীনের উপহাররূপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত। এই গ্রন্থে প্রথম বারো বৎসরের প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথমবারের প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিল জগদীশচন্দ্রের রচনা 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'। "এই উৎকৃষ্ট গল্পের লেখক নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে পুরস্কার (৫০৲) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়াছিল।" পরে অব্যক্ত

গ্রন্থে 'পলাতক তুফান' নামে ইহা জগদীশচন্দ্রের রচনারূপে স্বীকৃত হয়। এই গ্রন্থে প্রকাশকালে গল্পটির প্রভূত সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

প্রথম বৎসরের কুন্তলীনের উপহার-পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকিবে, তাহা সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল। জীবন। শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। ১৩২৪।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের পত্র ও উক্তি ৫৪১ ও ৫৪২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

জয়ন্তী-উৎসর্গ। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা কর্তৃক প্রকাশিত। ১১ পৌষ ১৩৩৮।

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূর্তি-উৎসবে প্রকাশিত রচনাসংগ্রহ। ইহার প্রথম প্রবন্ধ জগদীশচন্দ্রের লিখিত 'জয়ন্তী' [*Golden Book of Tagore*-এ প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধের শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কৃত অনুবাদ]।

রজত-জয়ন্তী। ভারত সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর (১৯১১-১৯৩৫)। সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। জুন ১৯৩৫...।

এই প্রবন্ধসংগ্রহে জগদীশচন্দ্রের 'জড় জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ এবং প্রাণী-জগৎ' রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। [ইহা অব্যক্তে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।]

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। পাঠশালা কার্যালয়। ৩০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। গ্রন্থকারের ভূমিকার তারিখ, ৩ জানুয়ারি ১৯৩৮।

অব্যক্ত

৯৩-৯৪ পৃষ্ঠায়, 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বসুকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্র বা মন্তব্য মুদ্রিত। ইহা মূলতঃ বাংলায় লিখিত কিনা তাহা জানিতে পারি নাই।

শ্রীঅসিতকুমার ঘোষ

বাংলা

জগদানন্দ রায়। **বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার।** অতুল লাইব্রেরি; কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ও ইসলামপুর, ঢাকা। 'বিজ্ঞাপনের' তারিখ, আশ্বিন ১৩১৯। পৃ ২, ।০, ২৪১।

সূচী ॥ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু; বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বা অদৃশ্যালোকের প্রকৃতি; বৈদ্যুতিক তরঙ্গই কি অদৃশ্যালোক উৎপাদক; আকাশ-তরঙ্গ; বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সমতলীভবন। দ্বিতীয় খণ্ড: প্রাণী ও উদ্ভিদ—জড় ও জীব; উদ্ভিদের আঘাত অনুভূতি; প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা; পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন; রসশোষণ; উদ্ভিদের বৃদ্ধি; উদ্ভিদের বৃদ্ধি-বৈচিত্র্য; উদ্ভিদ্ ও আলোক; উদ্ভিদের নিদ্রা; আচার্য বসুর শেষ পুস্তক। তৃতীয় খণ্ড: জড় ও জীব—সজীব ও নির্জীব; জড় জীবের আঘাত-অনুভূতি; অবসাদ; দৃষ্টিতত্ত্ব; দৃষ্টিবিভ্রম; ফোটোগ্রাফি।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার-বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী নানা দেশে নানা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের ভাষায় তাহা প্রচারিত না হওয়া, বড়ই ক্ষোভের কারণ হইয়া রহিয়াছে।' 'এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আচার্যবরের…কয়েকটি স্থূল তত্ত্বের' কথা লিখিত আছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। **উদ্ভিদের চেতনা।** আশুতোষ লাইব্রেরি, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৩৩৬। পৃ ॥০, ৮৬।

স্থচী ॥ প্রাণী ও উদ্ভিদ ; গাছের চেতনা ; রস-আকর্ষণ ও রস-সঞ্চালন ; উদ্ভিদের আলোকতৃষ্ণা ; উদ্ভিদের স্নায়ু ; উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন।

ফণীন্দ্রনাথ বস্থ। **আচার্য জগদীশচন্দ্র**। বরদা এজেন্সি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ভাদ্র ১৩৩৮। পৃ ২০৫।

স্থচী ॥ জন্মকথা ও পিতৃপরিচয় ; বিদ্যারম্ভ ; ভারতে শিক্ষা ; প্রথমবার বিলাত যাত্রা ; সরকারি চাকরি গ্রহণ ; দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা ; পারিস কংগ্রেস ও বিলাত প্রবাস ; বস্থ বিজ্ঞান মন্দির ; বঙ্গসাহিত্য ও জগদীশচন্দ্র ; ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন ; জগদীশচন্দ্রের বন্ধুবর্গ ; ঐতিহাসিক কাহিনী ; বৈজ্ঞানিক গবেষণা ; সপ্ততিতম জন্মোৎসব ; জাতীয় সমস্যায় জগদীশচন্দ্র ; প্রতিষ্ঠা ; জগদীশচন্দ্রের দান।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। **আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ**। পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। 'ভূমিকা'র তারিখ, ৩ জানুয়ারি ১৯৩৮। পৃ ॥০, ৯৬।

'আচার্যদেবের বিভিন্ন লেখা এবং তাঁহার নিকট হইতে যে সব কথা শুনিয়াছি, উহা এই পুস্তকের মালমসলা যোগাইয়াছে। অনেক স্থলে তাঁহার কথা দিয়াই তাঁহার পরিচয় দিয়াছি।'—ভূমিকা

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য-সংকলিত। **জগদীশচন্দ্র বস্থর আবিষ্কার**। বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। ১ ভাদ্র ১৩৫০। পৃ ৪০।

পরবর্তী মুদ্রণে (কার্তিক ১৩৫১) শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর তালিকা সংযোজিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। **চিঠিপত্র** ষষ্ঠ খণ্ড। শ্রীপুলিনবিহারী সেন

কর্তৃক সংকলিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা। মে ১৯৫৭। পৃ ॥৵০, ২৬২।

প্রধানতঃ জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর এই সংগ্রহের পরিশিষ্টে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় কবিতা, নিবন্ধ, পত্র, 'রবীন্দ্র-জগদীশ-প্রশ্নোত্তর', 'জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অন্যান্য পত্র', এবং বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয়ে জগদীশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বহু তথ্য গ্রথিত হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। **আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু**। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫ আগস্ট ১৯৫৮। পৃ ২, ৯৪।

গ্রন্থারম্ভে সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী এবং গ্রন্থশেষে ছয়টি পরিশিষ্টে জগদীশ-চন্দ্রের রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সূচী এবং জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রের তালিকা মুদ্রিত।

শ্রীমণি বাগচি। **বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র**। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ২০৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। নবেম্বর ১৯৫৮। পৃ ১২, ১৭৮।

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র। মূল জীবনী, শ্রীশুভেন্দু ঘোষ; সম্পাদনা শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা। ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫। পৃ ১৵, ২৫০।

প্রথম খণ্ডে জগদীশচন্দ্রের জীবনকথা আলোচিত।

দ্বিতীয় খণ্ড বিভিন্ন রচনার সংকলন। যথা—'আচার্য জগদীশচন্দ্র ও চারণকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়', দেবকুমার রায়চৌধুরী; 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; 'জগদীশচন্দ্র বসু', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; 'মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের শ্রদ্ধাঞ্জলি';

'জগদীশচন্দ্র···প্রসঙ্গে দুই রুশ বিজ্ঞানী', এম্ রাদোভ্স্কি; জীবনের ঘটনার কালানুক্রমিক তালিকা; এতদ্‌ব্যতীত, রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ড হইতে জগদীশচন্দ্রের তিনটি প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীঅবনীনাথ মিত্র। **আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দির।** এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স্, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৬৮। পৃ ৮, ৫২।

শিশু ও কিশোর -পাঠ্য

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ। **আচার্য জগদীশ** জীবনী ও আবিষ্কার। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। 'ভূমিকা'র তারিখ, আশ্বিন ১৩৩৮। পৃ ॥০, ১৩২।

তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক হইতে বিবরণ গৃহীত।

শ্রীসুধীন্দ্র রাহা। **আচার্য জগদীশচন্দ্র**। শরৎ-সাহিত্য-ভবন, ২৫ ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ, কলিকাতা। ১৩৫৬। পৃ ৭২।

শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। **জগদীশচন্দ্র**। স্বাক্ষর, ১১বি চৌরঙ্গি টেরাস, কলিকাতা। ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬। পৃ ।০, ৬৬।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। **আচার্য জগদীশচন্দ্র**। শিশু সাহিত্য সংঘ, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। অগ্রহায়ণ ১৩৬৩। পৃ ৵০, ৩০।

শ্রীঅনাদিনাথ পাল। **আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা**। আসাম বুক ডিপো, ১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। ১৩৬৫। পৃ. ॥০, ৩৪।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য -সংকলিত। **আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু**। জগদীশ-চন্দ্র বসু জন্মশতবার্ষিকী সমিতি, কলিকাতা। ১৯৫৮। পৃ ২, ৪৬।

গ্রন্থকারের 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' (১৯৩৮) ও 'জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার' (১৩৫০) হইতে সংকলিত।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। রচয়িতার নাম অনুল্লিখিত। স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩০ নভেম্বর ১৯৫৮। পৃ [।০], ২৩।

ইংরেজি

SIR J. C. BOSE. Biographies of Eminent Indians Series. G. A. Natesan & Co, Madras. Pp. 47. June 1918.

পুস্তিকাটিতে পরিশেষে প্যাট্রিক গেডিস -লিখিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বিবরণ ("The Indian Temple of Science") উদ্ধৃত আছে। লেখকের নাম নাই ; *Century Review* পত্রে ফণীন্দ্রনাথ বসু -লিখিত জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে প্রবন্ধ হইতে পুস্তিকাটির অনেক উপকরণ সংগৃহীত, এইরূপ উল্লেখ আছে।

Patrick Geddes. THE LIFE AND WORK OF JAGADIS C. BOSE. Longmans Green. 39, Paternoster Row, London. 1920. Pp. XII, 260.

Chapters : Childhood and Early Education ; College Days at Calcutta and in England ; Early Struggles ; First Researches in Physics—Electric Waves ; Further Physical Research and its Appreciation ; Physical Researches Continued—The Theory of Molecular Strain and its Interpretations ; Response in the Living and the Non-Living ; Holidays and Pilgrimages ; Plant Response ; Irritability of Plants ; The Automatic

Record of Growth ; Various Movements in Plants ; The Response of Plants to Wireless Stimulation ; Tropisms ; The Sleep of Plants ; Psycho-Physics : Friendships and Personality ; The Dedication ; The Bose Research Institute.

বাল্যজীবন, বিশ্ববিজ্ঞান-সভায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া জগদীশচন্দ্রকে যে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় তাহার ইতিহাস, সুদীর্ঘ বিজ্ঞানসাধনার বৈজ্ঞানিক তথ্যবহুল বর্ণনা, এবং পরিশেষে মানুষ জগদীশচন্দ্র ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বিবরণ দিয়া লেখক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই পুস্তক জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনার আকর-গ্রন্থ রূপে বিবেচিত।

SIR JAGADISH CHANDER BOSE. HIS LIFE, DISCOVERIES AND WRITINGS. G.A. Natesan., Madras. Pp. viii, 248. September, 1921.

এই গ্রন্থের প্রথমাংশ (পৃ ১-৪০) জগদীশচন্দ্রের জীবনী, পরবর্তী অংশে জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধ ও অভিভাষণাবলী বিষয়ানুক্রমে মুদ্রিত (পৃ ৪১-২১৭)। অতঃপর মডার্ন রিভিউ পত্র (১৯১২) হইতে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-প্রবন্ধাবলী ইত্যাদির তালিকা সংকলিত (পৃ ২১৮-২৪০)। পরিশেষে প্যাট্রিক গেডিস -লিখিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

D, M. Bose. J. C. BOSE'S PLANT PHYSIOLOGICAL INVESTIGATIONS IN RELATIONS TO MODERN BIOLOGICAL KNOWLEDGE. The Bose Research Institute, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta. The Preface is dated September, 1949. Pp. 80.

TRANSACTIONS OF THE BOSE RESEARCH INSTITUTE, vol. vii, 1947-48 হইতে পুনর্মুদ্রিত।

D. M. Bose. JAGADISH CHANDRA BOSE : A LIFE SKETCH. Bose Institute, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta. 1958. Pp. 31.

জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। জগদীশচন্দ্রের জীবনকথা ও বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত।

D. M. Bose. SCIENTIFIC ACTIVITIES OF JAGADISH CHANDRA BOSE. Bose Institute, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta. 1958. Pp. 18.

জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। জগদীশচন্দ্রের দীর্ঘকালব্যাপী (১৮৯৪-১৯৩৩) বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাস বর্ণিত।

Amal Home [Ed.]. ACHARYA JAGADIS CHANDRA BOSE BIRTH CENTENARY 1858-1958. Acharya Jagadis Chandra Bose Birth Centenary Committee, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta, November 30, 1958. Pp. viii, 84.

Contents : Jagadis Chandra Bose—The Story of His Life ; To Jagadis Chandra Bose, Rabindranath Tagore ; The Voice of Life, Jagadis Chandra Bose ; Memorial Address, · Rabindranath Tagore ; From Romain Rolland to Jagadis Chandra, A Letter ; The Bose Institute To-day ; Jagadis Chandra Bose—A Chronology.

গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের 'To Jagadis Chandra Bose' কবিতার (১৯০১) মূল বাংলা পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত আছে। ইহা ছাড়া জগদীশচন্দ্র বসুর কয়েকটি প্রতিকৃতি এবং আরও অনেকগুলি চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

EXHIBITION CATALOGUE: Acharya Jagadish Chandra Bose Birth Centenary. 1958.

জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে কয়েকদিনব্যাপী যে প্রদর্শনী হয় তাহার বস্তুসম্ভারের বিস্তৃত তালিকা ছাড়া ইহাতে জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, কেল্‌ভিন, বার্নার্ড শ, লর্ড র‍্যালে প্রমুখ মনীষীদের পত্রের পাণ্ডুলিপিচিত্র; জগদীশচন্দ্র বসু-বিজ্ঞান-মন্দির, জগদীশচন্দ্রের উদ্‌ভাবিত কয়েকটি যন্ত্রের এবং জগদীশচন্দ্র-বসু-সংগ্রহের কয়েকটি চিত্র মুদ্রিত আছে।

JAGADISH CHANDRA BIRTH CENTENARY CELEBRATION ADDRESSES AND TWENTIETH MEMORIAL LECTURE. 30th November 1958. Bose Institute, 93/1 Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta. Pp. 22.

Welcome Address, Dr. B. C. Roy; Address, Dr, D. M. Bose; Inaugural Address, Sri Jawaharlal Nehru; Presidential Address, Sm. Padmaja Naidu; Vote of Thanks, Prof. S. K. Mitra; Acharya Jagadish Chandra Bose Memorial Lecture, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan.

Arthur James Todd, THREE WISE MEN OF THE EAST AND OTHER LECTURES. University of Minnesota Press, U.S.A. 1927. Pp. X, 240.

এই গ্রন্থটি দেখিবার সুযোগ হয় নাই। A. Aronson প্রণীত

RABINDRANATH THROUGH WESTERN EYES (1943) গ্রন্থের পরিশিষ্টে ইহার উল্লেখ আছে।[১৫]

জর্মন

Patrick Geddes. LEBEN UND WERK VON SIR JAGADIS C. BOSE. Rotapfel-Verlag. Erlenbach-Zurich und Leipzig. ? Pp. 263.

প্যাট্রিক গেডিস-রচিত পূর্বোল্লিখিত ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ।

শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

সংযোজন

পৃ ৭৮। ছত্র ৬। দাসী পত্রে 'দেবধূপ' শব্দের এই পাদটীকা আছে— 'তুষারক্ষেত্রে জাত একপ্রকার সুগন্ধ গুল্মবিশেষ।'

পৃ ২৫১। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও জীবন-কথা ॥ গ্রন্থসূচী। যোগ হইবে—

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও শ্রীকুমারেশ ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত। **আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য**। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত। পৃ ১৬

---

১৫ শ্রীশোভন বসু ১৯৫৮ নভেম্বর সংখ্যা মডার্ন রিভিউতে, ঐ পত্রে (১৯০৭-৩৮) মুদ্রিত জগদীশচন্দ্র বসু-সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনার একটি সূচী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জগদীশচন্দ্রের জীবন ও আবিষ্কার-বিষয়ক বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।